

# অপারেশন কে বি সি

বাস্তবে যা ঘটেছিল

চিত্রদীপ চক্রবর্তী

# অপারেশন কে বি সি

## বাস্তবে যা ঘটেছিল

চিত্রদীপ চক্রবর্তী

বুক ফার্ম

Operation K B C

by

Chitradeep Chakraborty



প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ২০১৯

প্রচ্ছদ : উদয় দেব

অলংকরণ : অভি

**বুক ফার্ম**-এর পক্ষে শান্তনু ঘোষ ও কৌশিক দত্ত কর্তৃক

৭ এল, কালীচরণ শেঠ লেন, কলকাতা ৭০০০৩০ থেকে প্রকাশিত

চলভাষ : ৯৮৩১০৫৮০৪০/৯০৫১০১১৬৪৩

মুদ্রক : এস পি কমিউনিকেশন প্রা লি, কলকাতা ৭০০০০৯

জঙ্গলমহলের বাসিন্দাদের, যাঁরা আমাকে আপন করে নিয়েছিলেন।

# ভূমিকা

কার সঙ্গে যে কোথায় দেখা হয়ে যায়, তার কোনও ব্যাখ্যা হয় না। খুব ভুল না করলে, সম্ভবত মুম্বইয়ের ২৬/১১ হামলার সময় আমার সঙ্গে চিত্রদীপের প্রথমবার দেখা হয়েছিল। একটি বাংলা টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক হিসেবে কলকাতা থেকে এসেছিল ও। তখন মাওবাদী আন্দোলনের দৌলতে জঙ্গলমহলের নাম আমরা জানতে পারছি। আসলে, তার ঠিক আগে মাওবাদী সংগঠনের কথা উঠলেই সবার চোখের সামনে ভেসে উঠত ছত্তিশগড়। বাংলার মাওবাদীরা সেই ধারণাটা পুরোপুরি পাল্টে দিয়েছিল। নাশকতার ভয়ঙ্কর রূপ কেমন হতে পারে, তার ছবি গ্রাউন্ড জিরো থেকে টেলিভিশনের পর্দায় তুলে ধরত একটা ছটফটে সাংবাদিক। সেই সূত্রে, চিত্রদীপ আমাদের কাছে তখন পরিচিত মুখ। তাজ হানার ঘটনা কভার করার দিনগুলিতে কারও তেমন সুযোগ ছিল না কথা বলার। কিন্তু পুরো বিষয়টি যখন মিটে যায়, আমরাও অনেকটা ফ্রি, ঠিক সে সময় অনেকক্ষণ ধরে আড্ডা হয়েছিল একদিন।

হোয়াটসঅ্যাপ আর এসএমএসের মাধ্যমে মাঝে মাঝে আমাদের কথাবার্তা হয়। নতুন বছরে শুভেচ্ছা বিনিময়ের সময় চিত্রদীপের পাঠানো একটা এসএমএস পাই। সেখান থেকেই জানতে পারি, কলকাতা পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের বেশ কিছু চাঞ্চল্যকর অপারেশন নিয়ে ও একটা বই লিখছে। নিজেদের পেশাগত দক্ষতার কারনেই কলকাতা পুলিশের এসটিএফের নাম ইতিমধ্যেই আমরা জেনে গিয়েছি। ২০০৯ থেকে ২০১১ পর্যন্ত জঙ্গলমহল এলাকায় পুলিশের কাজ করা ছিল বেশ কঠিন। কিন্তু তার মধ্যেই এসটিএফ ওই সব দুর্গম জায়গায় একটি 'সাকসেসফুল' অপারেশন করতে পেরেছিল, যা এই নতুন বইয়ের বিষয়বস্তু।

আমি নিশ্চিত, একজন দায়িত্ববান ক্রাইম রিপোর্টার হিসেবে, চিত্রদীপ তাঁর চোখ দিয়ে যা দেখেছেন তা কলমের মাধ্যমে সঠিক ভাবে ফুটিয়ে তুলতে পারবেন। পাঠকেরাও পড়তে পারবেন বেশ কিছু রোমহর্ষক ঘটনা। আমার অনেক শুভেচ্ছা রইল।

১ জানুয়ারি, ২০১৯

শাসম তাহের খান
সিনিয়র এক্সিকিউটিভ এডিটর (ক্রাইম)
আজতক, ইন্ডিয়া টুডে গ্রুপ

# মুখবন্ধ : এক বাস্তবের গল্প

এক অসাধারণ সময়ের কথা। প্রায় গল্পের মতো সব ঘটনা। এটা এমন এক বাস্তব, যখন পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের শীর্ষ কর্তা থেকে সাধারণ পুলিশ কর্মী, প্রত্যেকে নতুন ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি, সাম্প্রতিক অতীতে যার কোন নজির ছিল না। সমস্যা সামাল দিতে অভিনব সব কৌশল আর পথ নিতে হয়েছিল আমাদের। আমি তখন রাজ্য পুলিশের ডিজি। আমরা যে সফল হয়েছিলাম, তার অন্যতম কারণ, আমাদের নিখুঁত, কঠোর টিম ওয়ার্ক। আশা করি, চিত্রদীপের বাস্তবধর্মী এই লেখা পড়তে পড়তে পাঠকও অনুভব করবে, কী অপরিসীম ধৈর্য, পরিশ্রম, কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছিল আমাদের।

ভূপিন্দর সিং, (প্রাক্তন ডিজিপি)

# আমার কথা

'নাটা শুনেই বুঝতে পারছি, বইটা আকর্ষণীয় হবে।' তাঁর এসএমএসটা যখন আমার মোবাইলে এসে ঢুকল, তত দিনে 'অপারেশন কেবিসি' প্রেসের পথে। প্রেরক যিনি, তাঁকে সারা ভারত ক্রাইম রিপোর্টিংয়ের জগতে 'অমিতাভ বচ্চন' হিসেবে মান্য করে। তিনি সত্যিই কিংবদন্তি। নাম, এস হুসেইন জায়েদি। সত্যি কথা বলতে, জায়েদির কাছে আমি অপরিচিত। তবুও সাহস করে এসএমএস করেছিলাম বইয়ের বিষয়বস্তু জানিয়ে। জায়েদির জবাব একজন ক্রাইম রিপোর্টারের কাছে তা আশীর্বাদের মতো।

দিল্লি পুলিশের স্পেশাল সেল অথবা মুম্বই পুলিশের অ্যান্টি টেররিস্ট স্কোয়াডের সাফল্য বা তদন্ত নিয়ে এর আগে একাধিক বই লেখা হয়েছে। তা নিয়ে সিনেমাও হয়েছে। কিন্তু কলকাতা পুলিশের এসটিএফের কার্যকলাপ নিয়ে তেমন বই নেই। তার একটা বড় কারণ ভালো-মন্দ সব কিছুই চেপে যাওয়ার চেষ্টা। একজন কুখ্যাত জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হলে বা বিস্ফোরক জাতীয় কোনও কিছু বাজেয়াপ্ত হলেও এখানকার পুলিশকর্তারা মুখে কুলুপ এঁটে দেন। বাইরের রাজ্যে পুলিশে অবশ্যই গোপনীয়তা আছে, তবে এই পর্যায়ে নয়। দীর্ঘ তিন দশক 'ক্রাইম বিট' কভার করতে গিয়ে দেখেছি, কলকাতা পুলিশের এসটিএফের দক্ষতা দিল্লি বা মুম্বই পুলিশের থেকে কোনও অংশে কম নয়। তবুও 'অপারেশন কেবিসি'র মতো দুরন্ত একটা কাজের বর্ণনা সাধারণ মানুষের জানতে দশ বছর লেগে গেল!

অপারেশন কেবিসি বাস্তব ঘটনার উপর নির্ভর করে লেখা। পুলিশ কীভাবে একজন মোস্ট ওয়ান্টেডকে গ্রেপ্তার করেছিল, সেই কৌশল একটা থ্রিলারের মতো। পরতে পরতে রয়েছে উত্তেজনা। যা পাঠকদের ভালো লাগবে বলেই আশা করা যায়। তবে একটা কথা এখানে স্পষ্ট ভাবে উল্লেখ করা উচিত। আর তা হল, প্রথাগত ছক মেনে ঘটনাগুলি লেখা হয়নি। গল্প বলার মতো করেই বইটি লেখার চেষ্টা করেছি। পেশাগতভাবে আমি সাংবাদিক। ফলে সেই ধারা প্রতিফলিত হয়েছে আমার লেখায়।

প্রথম থেকে যেভাবে ঘটনাক্রম পর পর এসেছে, তার মধ্যে অনেকগুলি এখনও বিচারাধীন বিষয়। ফলে কিছু ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়েছে। কয়েকটি চরিত্রের নামও তাই পাল্টাতে হয়েছে।

একটা বই লিখতে গেলে একা সব কিছু করা কখনই সম্ভব নয়। তাই কৃতজ্ঞতা স্বীকারের ক্ষেত্রে যে নামটা শুরুতেই করব, তাঁর নাম ঋতপ্রভ বন্দ্যোপাধ্যায়। মাত্র দু'মাস আগে যখন ঠিক করেছিলাম এই বিষয়টা নিয়ে বই লিখব, তখনও ভাবতে পারিনি শেষ পর্যন্ত এটা এত কঠিন একটা কাজ হয়ে দাঁড়াবে। মজার বিষয় হল, কথাবার্তা চূড়ান্ত হওয়ার পরের দিনই আমার বাইরে ঘুরতে যাওয়া পূর্ব নির্ধারিত ছিল। ফলে শতাব্দী এক্সপ্রেসে দিল্লি থেকে অমৃতসর যাতায়াতের সময়টাই কাজে লাগানো

শুরু করি। নিজের মোবাইলে শুরু হয় লেখা। যাওয়া এবং আসার পথে ট্রেনেই লেখা হয়ে যায় প্রায় পাঁচ হাজার শব্দ। ডিসেম্বর মাসে এনজেপি যাওয়ার সময় আবার সেই শতাব্দী এক্সপ্রেস। সেখানেও লিখে ফেলি আরও পাঁচ হাজার শব্দ। জানি না, এভাবে ট্রেন সফরের মাঝে আগে কখনও কোনও লেখা হয়েছে কি না!

অরিন্দম এবং অনির্বাণ যাঁর ছদ্মনাম, তিনি আসলে আমার লেখায় মূল চরিত্র। যখন জানতে পারলাম, ওই পুলিশ কর্মী আমাকে ঘটনাটা বলতে চান, তখন তাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য আমাকে শহরের তিনপ্রান্তের তিনটি সিসিডিতে যেতে হয়েছিল। একদিন অনির্বাণের জন্য অপেক্ষা করার সময় আচমকা সামনে এসে হাজির হন এক গোয়েন্দা অফিসার। তাঁকে এড়িয়ে যেতে কফির আগাম দাম দিয়েও চুপিচুপি বেরিয়ে আসতে হয়েছিল সেখান থেকে। একটা লেখার নেপথ্যে থাকে এরকম নানা ছোটখাট ঘটনা। যা একই সঙ্গে মজার এবং রোমাঞ্চের।

যার কথা আগেই উল্লেখ করেছি, সেই ঋত আমার সহকর্মী। নিজের লেখার জন্য আমার রাত জাগতে না হলেও ঋতকে রাত জাগতে কার্যত বাধ্য করেছি আমার থেকে বানান-জ্ঞান বেশি থাকার অপরাধে। এধরনের সদাহাস্যময় সহকর্মী না থাকলে বই লেখার মতো চাপ নেওয়া যায় না। সাহায্যকারী হিসেবে বন্ধু সুরবেকের নামও উল্লেখ করা প্রয়োজন। আরও একজন আছে এর নেপথ্যে, আমার ছেলে আয়ুষ। আমার খসড়া স্ক্রিপ্টটা ছুটির দিনে মুখে বলে দিলে খাতার পাতায় লিখে রাখত ওই। যা পরে অনেকটা কাজে দিয়েছে।

নিজে কোনও ঘটনা কভার করতে গেলে তাতে ভুল হওয়ার সুযোগ নেই। কিন্তু সমস্যা হয় তারিখ আর সাল নিয়ে। এটা যতবার হয়েছে, ফোন করে বিরক্ত করেছি এবিপি আনন্দের ঝাড়গ্রামের সাংবাদিক অমিতাভ রথকে। ফোন করতে হয়েছে সেখানকার সাংবাদিক চন্দন রাউথকে। কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছেও।

বইয়ের প্রচ্ছদ আঁকা উদয় দেবের। আমার ব্যক্তিগত মত, এমন প্রচ্ছদ শুধু ও-ই আঁকতে পারে। বইয়ের ভিতরের ছবি মলয় মুখোপাধ্যায় ওরফে অভির। ওর মতো প্রতিভা কেন শিলিগুড়িতেই পড়ে থাকল, তা বিস্মিত করে আমাকে। এই দু'জনকে কৃতজ্ঞতা জানানোর স্পর্ধা আমার নেই। একই কথা প্রযোজ্য বুকফার্মের প্রকাশক শান্তনু, কৌশিক, সুমিত, সোনালদের ক্ষেত্রেও।

'এই সময় সংবাদপত্র' কর্তৃপক্ষ আমাকে বই প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন, তাঁদের কাছেও আমার অনেক ঋণ। বিশেষ ভাবে বলতে চাই মা-স্ত্রী এবং শাশুড়ির কথা। বই লেখার বাহানায় অন্তত তিন মাস বাড়ির কোনও কাজ আমাকে করতে হয়নি তাঁদের প্রশ্রয়ে। বহু সহকর্মী, বন্ধু আমাকে উৎসাহ জুগিয়েছেন। বিভিন্ন তথ্য জানতে বারবার ফোন করেছি AS, AK, RK, SS (কোড নেমেই লিখতে হল বিশেষ কারণে) পুলিশ কর্তাদের। সাহায্য করেছেন তাঁরাও।

বই লেখা পাঠকদের জন্য। আসলে তাঁরাই সব। যদি ভুল হয়, ধরিয়ে দেবেন। পড়ে ভালো বা খারাপ লাগলেও গঠনমূলক সমালোচনার অবাধ স্বাধীনতা থাকছে। শেষে শুধু এটাই বলব, সবাই ভালো এবং সুস্থ থাকুন। এবং বেশি করে বই পড়ুন।

ধন্যবাদ,

চিত্রদীপ চক্রবর্তী

chitradeepchakraborty007@gmail.com

৯৮৩০০১৩৯৪৬

# সূচিপত্র

সাংবাদিক অরিন্দম

পুলিশ অরিন্দম

ছদ্মবেশী অনির্বাণ

# সাংবাদিক অরিন্দম



ঘরে আর কেউ নেই। শুধু ওরা দু'জন। দাঁড়ানো অবস্থায় টেবিলে কিছুটা ঝুঁকে পড়ে, উল্টো দিকে চেয়ারে বসে থাকা ব্যক্তির চোখে চোখ রেখে সে কথা বলতে শুরু করল।

'আপনাকে যে কোনও একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে। প্রচণ্ড ঝুঁকি নিয়ে আমি খবরটা করেছি। হয় খবরটা দেখাবেন, নয় তো আমাকে সেই টাকার একটা অংশ দেবেন। যেটা আপনি এটা না দেখিয়ে পাচ্ছেন।'

উত্তরের অপেক্ষা না করে ঠান্ডা গলায় চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো বলে সল্টলেকের সেই অভিজাত, সাদা রঙের বহুতল থেকে দ্রুত পা চালিয়ে নেমে এসেছিল রিপোর্টার অরিন্দম রায়। এক বারও পিছনে ফিরে তাকায়নি। হিমশীতল গলায় কথাগুলো বললেও অরিন্দমের মুখে-মাথায়-বুকে তখন গনগনে আগুন। রাগে ফুসতে ফুসতে। যতটা দুঃখ, তার চেয়ে রাগ অনেক গুণ বেশি। চোখ ফেটে বেরিয়ে আসতে চাইছিল জল নয়, লাভাস্রোত।

অরিন্দম মুর্শিদাবাদের ছেলে। ছোটবেলা থেকে জেনে এসেছে, সাংবাদিকতা একটা স্বাধীন পেশা। কাউকে রেয়াত করতে হয় না। অন্যায় না করলে, সত্যের পথে অবিচল থাকলে কোনও কৈফিয়তও কাউকে দেওয়ার দরকার নেই। তা হলে এমন কেন হল? একা একা এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব নয়। কাউকে একটা দরকার। এমন একজনকে, যাকে সব কিছু বলে নিজেকে কিছুটা ঠান্ডা করতে পারবে। হয়তো সেই অচেনা ব্যক্তির কোনও 'ভোকাল টনিক' তাকে জাগিয়ে তুলবে নতুন করে। কিন্তু আশপাশে তো কেউ নেই। অগত্যা, অশান্ত মনটাকে শান্ত করতে অরিন্দম চলে গেল নলবনের ভিতর। যদি এখানে খানিকটা সময় কাটালে মানসিক শান্তি পাওয়া যায়, সে কথা ভেবে। আধ ঘণ্টা জলের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক, নিজের খেয়ালে।

অসন্তোষের প্রাথমিক ঝড় কাটার পর খেয়াল এল, পকেটে তো টাকা নেই। যদি মুর্শিদাবাদের বাড়িতে ফিরে যেতেই হয়, তা হলে সেই টাকা আসবে কোথা থেকে? কে দেবে?

এমন আরও হাজার সাতপাঁচ দুর্ভাবনা মাথার ভিতর অনবরত ঘুরপাক খাচ্ছে তখন। ভাবতে ভাবতে এর মধ্যে সন্ধ্যাও যে নেমে এসেছে, সেটা হঠাৎ উপলব্ধি হল অরিন্দমের। এখান থেকে উঠতে আর দেরি করলে বাড়ি ফেরার ট্রেন পাওয়া যাবে না। টানা ভাবনার ছেদ ঘটিয়ে অরিন্দম উঠে এল রাস্তায়। রাতের সল্টলেকে পথঘাট এই সময়ে বড্ড বেশি জমজমাট। অনবরত গাড়িঘোড়া হুঁসহাস

করে যাতায়াত করে। কাজে নতুন যোগ দেওয়া ছেলেমেয়েদের অফিস ফেরতা হইহুল্লোড়— এসব কিছু মিলিয়ে যে আবহটা তৈরি হয়, সেটা কিছুটা হলেও কারও মানসিক অবসাদ সাময়িক সময়ের জন্য কাটিয়ে দিতে পারে। অরিন্দমের অশান্তি কিন্তু কাটছিল না।

জিনসের পকেট থেকে মোবাইলটা বার করে অরিন্দম দেখতে পেল, পকেটে চাপ পড়ে কখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একরাশ বিরক্তি নিয়ে মুঠোফোন চালু করে কিপ্যাডে আঙুল চালিয়ে অরিন্দম সোজা রিং করল বন্ধু কাজলের মোবাইলে। আসলে বন্ধু হলেও কাজল অরিন্দমের সহকর্মীও বটে। সংবাদ মাধ্যমের পরিবেশ-পরিস্থিতি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর সহকর্মীর সংখ্যা বাড়ায়। আবার একই সঙ্গে বন্ধুর সংখ্যা কমায়। কাজল কলকাতায়, মানে হেড কোয়ার্টারে থেকে কাজ করলেও ওর অমায়িক ব্যবহারের জন্য জেলার সাংবাদিকদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়। অরিন্দম ফোন করার পর বোঝা গেল, আজ অফিসে যা হয়েছে, সেই বিষয়টা কাজলের অজানা নয়।

কাজল কিন্তু সহকর্মী-বন্ধু হিসেবে, অনেকটা সেই অধিকারেই বলা চলে, অরিন্দমকে মৃদু ভর্ৎসনা করল। সরাসরি বলল, ‘তোর ও ভাবে বেরিয়ে আসাটা ঠিক হয়নি। শুধু সাংবাদিকতা কেন, যে কোনও পেশাতেই ধৈর্য ব্যাপারটা অত্যন্ত জরুরি। সেটা তুই আজ মাথায় রাখলি না।’ অরিন্দম কী একটা বলতে যাচ্ছিল। কাজল থামিয়ে দিয়ে বলল, ‘একটা কথা তুই বুঝলি না যে, প্রতিবাদ করার জন্য স্থান আর কাল দু’টোই ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। পেজ থ্রি সিনেমাটা তোর মনে নেই? ক্রাইম রিপোর্টার অতুল কুলকার্নি পেজ থ্রি রিপোর্টার কঙ্কনা সেনশর্মাকে কী বলেছিল? বদল আনতে গেলে সিস্টেম থেকে বেরিয়ে গিয়ে নয়, সিস্টেমের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়।’

অরিন্দম বুঝতে পারল, তাকে নিয়ে বহুক্ষণ ধরে জমে থাকা ক্ষোভ ও অভিমান একসঙ্গে উগরে দিচ্ছে কাজল। তার ভাল লাগছিল না। সে জানে, কাজল সহকর্মী হয়েও যে রকম বন্ধু, তাতে ভালোর জন্যই এ সব বলছে। এটা ফোকটে জ্ঞান বিতরণ নয়। তবু এখন এ সব সে শুনতে চায় না। তাই একটা সময় পর কোনও রকম ভণিতা না করে অরিন্দম সরাসরি বলেই ফেলল, ‘শোন, আমার কিছু টাকার দরকার। বাড়ি ফিরতে চাই।’

কয়েক সেকেন্ড নীরবতা। ও পার থেকে এবার কাজলের প্রশ্ন, ‘তুই এখন ঠিক কোথায় আছিস?’

‘আমি নলবনের সামনে। ট্রেন ধরতে শিয়ালদা যেতে হবে। টাকাটা তাড়াতাড়ি পেলে সুবিধে হত। তুই এটা সামনের মাসেই...।’

কথা শেষ হল না। অরিন্দম দেখল, লাইন কেটে গিয়েছে।

বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। মিনিট দশেকের মধ্যেই নলবনে হাজির হল অসময়ের প্রকৃত বন্ধু। অরিন্দমের জামার পকেটে ১০০ টাকার দু’টো নোট ঢুকিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরল তারপর কাজল বলল, ‘সাবধানে বাড়ি যাস। ফোন করে হোক, মেসেজ পাঠিয়ে হোক, অন্তত পৌঁছনো সংবাদটা দিস।’

অরিন্দম কিছু বলল না। আজ তার চোয়াল কিছুতেই নরম হচ্ছে না। কপালের ভাঁজ কাটছে না।

শিয়ালদহ স্টেশনে সন্ধের দিকে ট্রেন ধরতে এলে অরিন্দমের একটা কথা বার বার মনে হয়। এত ভিড়ে কেউ একটা বোমা ফাটলে কী হবে? কত লোক যে একসঙ্গে মারা পড়বে, তা গুণে শেষ করা যাবে না। যারা এ সব কাণ্ড ঘটায়, তারা ধরা পড়ে যাওয়ার ভয় করে না, নিজের জীবনেরই পরোয়া করে না। কোনও জঙ্গি বা সন্ত্রাসবাদী সংগঠনে প্রশিক্ষণ এই ভাবেই হয়। প্রশিক্ষণের একটা গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ মগজধোলাই। যা জীবনকে বাজি রেখে অকুতোভয়ে এগোতে শেখায়। কিন্তু এ সব ভেবে অরিন্দমের আজ কষ্ট হল। জেহাদি না হয়ে সে-ও তো নিজের জীবন কার্যত বাজি রেখেছিল। শুধু পেশার তাগিদে, সৎ ও নির্ভীক সাংবাদিকতার জন্য।

শেষ রাতে বাংলাদেশ সীমান্তে গোরু পাচারের ছবি তুলতে গিয়ে ধরা পড়ে গেলে, শুধু তার হাড়গোড় ছাড়া আর কিছুই বাড়ি ফিরত না। অরিন্দম আবার চ্যানেলের স্টাফ রিপোর্টার নয়। নিজেকে বলে, 'ঠিকে ঝি'। খবর ও ছবি পাঠিয়ে সে অল্প মাসোহারা ও সামান্য ট্র্যাভেল অ্যালাওয়েন্স পায়। ফলে, খারাপ কিছু হয়ে গেলে অফিসও হাত গুটিয়ে নিত। সীমান্তে দাঁড়িয়ে অত ঝুঁকি নিয়ে করা খবরটার সলিল সমাধি নিজের চোখের সামনে দেখে মেজাজটা আজ আর ধরে রাখতে পারেনি। সম্পাদকের বিরুদ্ধে এক রকম বিদ্রোহ করে বেরিয়ে এসেছে অফিস ছেড়ে। আপাতত তার সিদ্ধান্ত, যাই হোক না কেন, ওই চ্যানেলে আর ফেরা নয়।

কিন্তু এর পর কী? সেই প্রশ্নের উত্তরও অবশ্য আপাতত নেই তরুণ আর টগবগে রিপোর্টারের কাছে। ভিড়ের মধ্যে একা একা হাঁটতে গিয়ে খণ্ড খণ্ড প্রচুর ছবি ভেসে উঠছিল তার চোখের সামনে। কত স্বপ্ন দু'চোখে নিয়ে প্রবেশ করেছিল সাংবাদিকতার জগতে। স্কুল, কলেজে পড়ার সময় শুনত, নিরপেক্ষতা এই পেশার মূলমন্ত্র। অথচ, এত অল্প সময়ের মধ্যে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা কুরে কুরে খাচ্ছিল প্রতিটি মিনিটে।

''এয়ার', অর্থাৎ দেখানো হলে তবেই স্টোরি পিছু পাঁচশো টাকা করে পাবে।' স্পষ্ট মনে আছে, প্রথমদিন সল্টলেকের দপ্তরে ঢোকার পর এটাই জানিয়েছিলেন সম্পাদক। তাতেই রাজি হয়ে গিয়েছিল অরিন্দম। হবে নাই বা কেন? তখন স্বাভাবিক নিয়মে বয়স কম, তাই সাহসও ছিল বেশি। ফলে বিকল্প কোনও চিন্তাভাবনা মাথাতেই আসেনি।

আজকের ঘটনার পর ভাবনাটা কোথায় যেন আচমকা হোঁচট খেয়ে গেল। আসলে, শিয়ালদা স্টেশনে ভিড়ের মধ্যে ট্রেনটা এমন গাঁক গাঁক করে আওয়াজ করে উঠল যে, সব তালগোল পাকিয়ে যেতে বেশি সময় লাগলো না। হুড়োহুড়ি করে এক সময়ে ট্রেনে উঠে পড়ল অরিন্দম। ফাঁকা একটা সিট পেয়ে বসে পড়ল। তারপর পর বুঝতে পারল, শরীর আর চলছে না। তার চেয়েও বড় কথা, একটা হতাশা থেকে থেকে মোচড় দিচ্ছে। সারা দিন সে ভাবে খাওয়া হয়নি। খাবেও বা কী করে? পকেটে পয়সা থাকলে তবেই তো পেটে কিছু দেবে।

এতক্ষণ গুমোট হয়ে থাকার পর ট্রেনে উঠতেই মনটা বাড়ি ফেরার তাড়নায় যেন খাবার চাইছিল। পকেট হাতড়ে পাওয়া গেল চল্লিশ টাকা। সামনে দিয়ে ঝালমুড়িওয়ালা ঘুরে বেড়াচ্ছিল। খানিকটা পেট ভরল দশ টাকার মুড়ি খেয়ে। মাথাটা কেমন ঝিমঝিমও করছিল। মনে হল, একটা চা খেলে হত।

সামনের জানলা দিয়ে গলা বার করে হাঁক পাড়তেই হাতে কেটলি নিয়ে ছুটে এল তিনজন। তারা সবাই সম্ভবত আশপাশে ছড়িয়ে ছিল। একসঙ্গে এতজন হাজির হওয়ায় খানিকটা অস্বস্তিতে পড়ল অরিন্দম। এদের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নেওয়া চাপের বিষয়। মুখ বাড়িয়ে বলতে হল, 'যে কোনও একজন দাও। তোমরাই ঠিক করো, কে দেবে।' তিনজনই দেখা গেল, চা বিক্রি করতে চায়। তাই নিয়ে শুরু হল বচসা। ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট ভালো লাগছিল না আর। তাই অপেক্ষাকৃত বয়স্ক যিনি, তাঁকে দেখে অরিন্দম বলল, 'আপনি দিন।'

চা শেষ করার মিনিট পাঁচেক কাটতে না কাটতেই ছেড়ে দিল ট্রেন, লম্বা হুইসল বাজিয়ে। ভেতরের কোলাহল ততক্ষণে থেমে এসেছে অনেকটা। আসলে এই ট্রেনে দূরদূরান্তের অফিসযাত্রীরা যান। আসার সময় তারা যতটা টগবগ করে ফুটতে থাকেন, রাতে বাড়ি ফেরার সময় তাঁদের এনার্জি বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। তখন কেউ চোখ বুজে সামান্য জিরিয়ে নেন। কেউ বা আবার একটু তাস বার করে সামান্য আলোতে দু'একজনকে জুটিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। হকারদের গলার স্বরও এই সময়টায় নামতে শুরু করে। দিন শুরুর সেই তেজ আর থাকে না।

অরিন্দম অবশ্য এসবের বাইরে। নিজের জায়গায় গা এলিয়ে দিয়ে ভাবার চেষ্টা করছিল কলকাতায় এক কাপ চা বিক্রি করতেই এত লড়াই। সেখানে মুর্শিদাবাদ থেকে এসে সাংবাদিকতার মতো প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ভরা পেশাতে, সে ঠিক কতটা কী করতে পারবে? বাড়ি থেকেও চাপ আসা শুরু হয়েছে, নিজের পায়ে শক্ত জমিতে দাঁড়ানোর জন্য। কিন্তু এতদিনে সে বুঝে উঠতে পারল না, এই শক্ত জমি বস্তুটি কী। পেশাগত স্থায়িত্ব নাকি নিছক টাকা উপার্জন?

ট্রেন এবার গতি বাড়ানো শুরু করেছে। তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে দুলতে দুলতে চলেছেন ভেতরে থাকা যাত্রীরা। আলোও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে কিছুক্ষণ আগে। মুখোমুখি বসে থাকা ভদ্রলোক ব্যাগ থেকে সকালের বাসি হয়ে যাওয়া কাগজটাই আবার বার করে নতুন ভাবে পড়া শুরু করেছেন। অন্য অনেকের মতো অরিন্দমও মাথাটা তুলে সেই কাগজ পড়ার চেষ্টা শুরু করল। তবে সেই কষ্ট বেশিক্ষণ করতে হল না। ভদ্রলোক সম্ভবত সকালেই পুরোটা পড়ে নিয়েছিলেন, কাজেই মিনিট দশেকের মধ্যে দ্রুত কাগজটা ভাঁজ করা শুরু করলেন। এবার হাত বাড়িয়ে দিল অরিন্দম, চেয়ে নিল কাগজটা। ট্রেনের ভেতর একে আলো কম, তাতে দুলতে দুলতে খুব বেশি পড়াও যায় না। অরিন্দমের তাতে কি এসে যায়? টাইম পাস করার মতো কিছু তো অন্তত দরকার। কাজেই কাগজটা যতক্ষণ পড়তে পারবে নিজেকে চিন্তামুক্ত রাখা যাবে সেই কয়েকঘন্টা। পড়বে কী? নতুন কিছু থাকলে তো! প্রথমটা পাতাটা জুড়ে শুধু রাজনীতির কচকচানি। দ্রুত ওই পাতা উল্টে ভেতরে যেতেই চোখ আটকে গেল একটা খবরে—মুর্শিদাবাদ থেকে লস্কর-ই-তইবার তিন জন লিঙ্কম্যান ধৃত, সিআইডির হাতে প্রচুর বিস্ফোরক।

কে জানে কেন, তবে খবরটা পছন্দ হয়ে গেল তার। এক নিঃশ্বাসে পড়ে ফেলল সেটা।

পড়া শেষ হতেই অরিন্দমের মনে প্রশ্ন এল, 'আচ্ছা, এদের ধরা হল কীভাবে?' কিন্তু সে প্রশ্নের জবাব পাওয়া মুশকিল। কাগজটা আর একটুও পড়তে ইচ্ছা করল না। সেটা ভাঁজ করে তুলে দিল

মালিকের হাতে। তারপর কৌতূহল থেকে একটা ফোন করে বসল তাদের চ্যানেলের পুলিশ বিটের রিপোর্টার রূপকথাকে। অরিন্দমের ফোন নম্বর সেভ করা ছিল দক্ষ পুলিশ রিপোর্টার রূপের। রিনরিনে গলায় ওপার থেকে ভেসে এল, ‘বলো দাদা, তোমার সঙ্গে ঝামেলার খবরটা শুনলাম। খুবই খারাপ হয়েছে বিষয়টা। আর যাই হোক, হুটহাট করে কোনও সিদ্ধান্ত নিও না।’ অরিন্দম সরাসরি জানতে চাইল, ‘একটা জিনিস বলবে? কাগজে দেখলাম সিআইডি টেররিস্ট সন্দেহে কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করেছে। কিন্তু কী ভাবে তাদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তা কোথাও জানতে পারলাম না। একবার বলবে এই ভিতরের গল্পটা কী?’ ফোনের ওপ্রান্ত থেকে রূপকথার গলায় আমতা আমতা স্বর, ‘না, মানে পুলিশ কর্তারা আমাদের সেটা বলেননি। তবে কাল একবার চেষ্টা করে দেখব।’ ‘ঠিক আছে, কাল জানতে পারলে একবার বোলো। আমার বিষয়টা নিয়ে আগ্রহ রয়েছে তাই।’ বলল অরিন্দম।

ট্রেনটা সম্ভবত কোনও একটা স্টেশনে দাঁড়িয়ে গেল। শুরু হল চাওয়ালাদের হাঁকডাক। মিনিট পাঁচেক পর আবার দুলে উঠল ট্রেন। নিজের জায়গা থেকে উঠে সে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। এ সময় চোখেমুখে খানিকটা ফ্রেস হাওয়ার প্রয়োজন। দরজার কাছে আসতেই মুডটা খারাপ হয়ে গেল। ওখানে দু’জন যাত্রীর মধ্যে তীব্র ঝামেলা শুরু হয়েছে। আবার ভেতরের দিকে এগিয়ে গেল সে।

নিজের আসনে বসে মনটা শান্ত করতে চোখ বুঝে ফেলল একসময়। আর তারপরই নিজের মনে চিন্তা করতে করতে নিয়ে নিল চরম একটা সিদ্ধান্ত। যা-ই হোক না কেন, আর সে সাংবাদিকতা করবে না। শুরু করবে নতুন একটা পেশাদার জীবন। আর কখনও নিজে খবর করবে না সাংবাদিক অরিন্দম রায়। বরং, এমন একটা পেশা বেছে নেবে, যাতে খবরের জন্য সাংবাদিকরা তার পিছনে ঘুরে বেড়াবে। তাকে নিয়েই খবর করবে। যেখানে ভালো কাজ করলে সংবাদপত্রে ছবি, নাম প্রকাশিত হবে তার। টিভি চ্যানেলে দেখানো হবে বাইট (বক্তব্য)। সবাই দেখতে পাবে তাকে। দেখবে তার সেই সম্পাদকও।

বাইরে গাঢ় অন্ধকার। ভেতরে কেমন দম বন্ধ হয়ে আসছিল অরিন্দমের। একটু আলোর খোঁজে আবার দরজার সামনে যেতে ইচ্ছে করল আরও একবার। তবে, এবার আর সমস্যা হল না। ফুরফুরে হাওয়ায় ক্লান্তিটাও যেন কেটে গেল। অনেকটা সময় কেটে গেলেও কাগজে পড়া খবরটা এখনও কেমন যেন মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে অনবরত। কেন এমন হচ্ছে? নিজেকেই প্রশ্ন করল সে। তাহলে কি পুলিশের পেশাটাকেই নিজের অজান্তে ভালোবেসে ফেলল সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া এই তরুণ ক্রাইম রিপোর্টার? দূরে দেখা গেল, ছোট্ট একটা আলোর রেখা। সম্ভবত গ্রামের কোনও বাড়িতে রাতে আলো জ্বলছে। দ্রুতগতিতে ট্রেন যাওয়ায় পুরোটা বোঝাও যাচ্ছে না। আচমকাই মনে হল, গায়ে কেমন যেন জলের স্পর্শ। এখানে জল আসবে কোথা থেকে? দরজার ঠিক সামনে ট্রেনের কলের পাশে তো কেউ নেই! বাইরে ঘুটঘুটে অন্ধকার হলেও চাঁদের আলো ঠিকরে বেরোচ্ছে। কাজেই বৃষ্টির জলও নয় এটা। অস্ফুটে নিজের মুখ থেকেই বেড়িয়ে এল, ‘ভগবানও চাইছে, আমি নতুন কোনও কাজের সন্ধান করি। শুরু করি অন্য কিছু।’ ট্রেনের দরজায় দাঁড়িয়ে চরম সিদ্ধান্তটা নিল অরিন্দম —‘আমি পুলিশের ইউনিফর্ম গায়ে তুলব। ওটাই এখন থেকে আমার লক্ষ্য।’

পর দিন সকাল। ট্রেন পৌছে গেল নির্দিষ্ট গন্তব্যে। স্টেশন ছোট হলেও হাঁকডাকের কমতি নেই। ছুটে এল রিকশওয়ালা, 'কোথায় যাবেন?'

সারা রাস্তা ক্যাচোড়ম্যাচোড় আওয়াজ তুলে আধঘণ্টার মধ্যে বাড়ির সামনে হাজির নতুন ভাবে জীবনটাকে ভাবা এক তরুণ। বাড়ির লোকেরা খানিকটা অবাকই হলেন। আজ তো ফেরার কথা নয়। তাহলে? কোনও সমস্যা হল নাকি? অত কিছু একসঙ্গে ভাবতে ভালো লাগছিল না অরিন্দমের। চটজলদি স্নান সেরে খাওয়াদাওয়া করে ঘুমোতে চলে গেল নিজের ঘরে। বাড়ির লোকেদের হাজার প্রশ্নেও মুখ খুলল না সে। । কিন্তু, বললেই কি আর ঘুম আসে? তাকেও সময় দিতে হয়। অধৈর্য হয়ে পড়া তরুণের সেই সময়টুকুও বাড়তি খরচ করতে মন চাইছিল না। খাট থেকে উঠে আলমারির মধ্যে স্টকে রাখা পুরনো ঘুমের ওষুধের একটা নিয়ে জল দিয়ে ঢক ঢক করে গিলে ফেলল। এরপর আর বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। চোখ নিজের থেকেই বুজে এল ।

সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পেল সামনে ডাঁই করে রাখা খবরের কাগজ। মন চাইল না সেগুলি উল্টে দেখতে। খবরের প্রতি মনটা তোতো হয়ে গিয়েছিল। চা খেয়ে খানিকটা সময় গুগলের পিছনে ব্যয় করে ফোন ঘোরাল এক পরিচিত পুলিশ অফিসারকে। 'আচ্ছা, পুলিশের সাবইন্সপেক্টর পদে চাকরি পেতে গেলে কি করতে হয়?' অফিসার জবাব দিলেন, 'কেন ভাই, আবার কারও পিছনে বাঁশ দেওয়ার চেষ্টায় আছো নাকি? কেউ আবার টাকা দিয়ে ঢুকেছে বুঝি!' একরাশ হতাশা মনে থাকলেও হাসি চেপে রাখতে পারল না অরিন্দম। 'আরে না না, আমি পুলিশের চাকরি করতে চাই। জানি আপনার বিশ্বাস হবে না। তবুও বলুন না একবার। আসলে আমি পুরো প্রিপারেশন নিয়েই বসতে চাইছি, নো ব্যাক ডোর। তাছাড়া সাংবাদিকতা ছেড়ে অনেকেই তো পুলিশে চাকরি করছেন।'

কিন্তু সাংবাদিকদের কে আর কবে বিশ্বাস করেছে? পুলিশ অফিসার ঠাট্টার সুরেই বললেন, 'বলে দিচ্ছি সবই। তাছাড়া তোমাদের খোচরবৃত্তি করার গুণটা এই পেশায় ভালো কাজে দেবে।' পকেট থেকে ছোট ডায়েরিটা বার করে খচখচ করে তাঁর কাছ থেকে পুরোটা নোট নিয়ে নিল অরিন্দম। সেই অফিসার অবশ্য একটা সাহায্যও করলেন বটে। তাঁর কাছ থেকেই জানা গেল, কয়েকদিন আগে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে, কলকাতা পুলিশে সার্জেন্ট পদে লোক নেওয়া হবে। পরীক্ষাও হবে খুব তাড়াতাড়ি। মনে হঠাৎ করেই খানিকটা জোর পেয়ে গেল সে। তাহলে সামনেই সুযোগ একটা আসতে চলেছে নিজেকে প্রমাণ করার।

পরের দিন সোজা জেলা পুলিশ অফিসে। সেখানে দেখা হল এক পরিচিত অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের সঙ্গে। সব কথা খুলে বলল তাঁকে। ওই এএসপি পরামর্শ দিলেন, কীভাবে শুরু করতে হবে পড়াশুনো। ইচ্ছে না থাকলেও পরদিন থেকে নিজের স্বার্থেই খবরের কাগজগুলো আবার পড়া শুরু করতে হল। কারণ, না হলে অজানা থেকে যাবে সমসাময়িক নানান ঘটনা। হিসেব-টিসেব করে অরিন্দম দেখল আগামী ছ'মাস তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে বাইরের আর কিছু নয়। একটু পড়াশুনোর প্রতি পরিশ্রম বাড়াতে হবে তাকে।

প্রথম সপ্তাহটা একটু কষ্ট হচ্ছিল। ঘরবন্দি হয়ে থাকতে কারই বা ভালো লাগে। যদিও মনে মনে ঠিক করে নিয়েছিল, যাই হোক না কেন, পরীক্ষাটা তাকে উতরে যেতে হবেই। প্রস্তুতি শুরুর সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট পদের চাকরির ফর্ম তুলে তা-ও জমা করে দিয়েছিল নির্ধারিত সময়ের মধ্যে। যত দিন ক্রমশ এগিয়ে আসছিল, তত যেন কেমন আড়ষ্ঠ লাগছিল। তবুও নিজের মনে হতাশার প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য পড়ার পাশাপাশি গান শোনাটাকে কার্যত অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল চাকরিপ্রার্থী যুবক। তাতে অনেকটা হালকা লাগত। ঘরের ভিতর আটকে থাকতে থাকতে একটা জেদ যেমন চেপে বসছিল, তবে এটাও ঠিক এজন্য নিজের ফোকাসকে আরও নির্দিষ্ট করতে পারছিল সে। ইচ্ছে করেই নিজের মোবাইল ফোন ব্যবহারটা কমিয়ে দিয়েছিল। শুধু দরকার পড়লে সামান্য কথা বলেই ফের বন্ধ করে দিচ্ছিল ফোন। মাঝে মধ্যে অবশ্য টিভিতে চোখ রাখতে খারাপ লাগতো না। মনে হত, যেন আর্মি ক্যাম্পের ভেতর একটুখানি খোলা হাওয়া ঢুকছে।

প্রস্তুতি নিতে নিতেই পরীক্ষা দেওয়ার সময় চলে এল। তবে অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন শুভানুধ্যায়ী এতটা সাহায্য করবে তা চিন্তাও করতে পারেনি অরিন্দম। এটা ভেবে অবশ্য ভালো লাগল যে, এখনও এত লোক তাকে ভালোবাসে। পরীক্ষা দিতে যাওয়ার ঠিক আগে মনে পড়ল সেই সম্পাদকের মুখ। সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে আসার সময় পিছন থেকে বলা তাঁর কথাটা যেন কানে বেজে উঠল আরও একবার— 'মিডিয়াতে কয়েকমাসের চাকরিতে নিজেকে বিরাট কেউকেটা ভাবছে। জার্সিটা খুলে নিলে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না বাজারে।' ওই একটা কথা শোনার পরই চূড়ান্ত সিদ্ধান্তটা নিয়ে ফেলেছিল সে। আর সেটা ছিল চাকরি ছাড়ার। আজ আর সেসব কথা ভাবার বিশেষ সময় নেই। যা ছেড়ে এসেছে, তা আর ফিরে পেতেও চায় না।

পরীক্ষা হলে ঢোকার সময় একটা অদ্ভুত কনফিডেন্স কাজ করল। মন বলছিল, যাই হোক না কেন,পরীক্ষায় ঠিক উতরে যাওয়া যাবে। আসলে, কলেজ পর্ব মেটার পর বাড়ি থেকে হাজার নির্দেশ-অনুরোধ এলেও সরকারি পরীক্ষায় আগে কখনও বসেনি। প্রথমে খাতা দেওয়া হল, তারপর প্রশ্নপত্র। পনেরো মিনিটে প্রশ্নটা পড়া শেষ করে মনে হল, পুরো বিষয়টা সামাল দেওয়া কোনও ব্যাপারই নয়, শুধু মাথা ঠান্ডা রেখে নিজের কাজটা করে যেতে হবে। আশেপাশে দেখা গেল দু'রকম প্রতিক্রিয়া। কেউ উত্তেজিত, কেউ বা মাথা নিচু করে শুরু করেছে উত্তর লেখা। টানা তিনঘণ্টা কোথা দিয়ে যে কেটে গেল,বোঝা গেল না। শেষ ঘণ্টা বাজার পর খাতাটা জমা দিতে দিতে মন বলছিল চাকরিটা হবেই হবে।

তারপর যেন একটা অনন্ত প্রতীক্ষা। কবে জানা যাবে ফলাফল। একটা সময় মনে হচ্ছিল তাহলে কি হল না? আবার কি নতুন করে ভাবতে হবে অন্য কিছু? প্রতিটি দিন যেন কাটতেই চাইছিল না সেসময়। খানিকটা হতাশা কাটাতেই বাইরে বেড়িয়ে বন্ধুদের সঙ্গে আবার আড্ডার আসরটা নতুন করে জমিয়ে তুলছিল কয়েকদিনে। তারাও অবশ্য প্রথম দিকে খানিকটা হ্যাটা করত। 'আরে, কে এসেছে দেখ! আমাদের বুদ্ধিজীবী বন্ধু।' এরকম নানান আওয়াজও মুখ বুজে সহ্য করে নিতে হচ্ছিল।

সত্যি তো, সাংবাদিকতা করার সময় দীর্ঘদিন নিজের ছোটবেলার বন্ধুদের থেকে অনেকটাই দূরে সরে গিয়েছিল। কোন এক সিনিয়র সাংবাদিক তাকে একবার বলেছিল,'সাংবাদিকদের কোনও বন্ধু হয় না। আশেপাশের সবাই শত্রু। পার্থক্য হল, কেউ কম, কেউ বেশি।' নিজের অজান্তে কখন যেন সেটাকেই ধ্রুব সত্য বলে মেনে নিয়েছিল এক সম্ভবনাময় সাংবাদিক, তা এখন আর মনে নেই। বন্ধুরা অবশ্য অতশত কিছু মনে করে রাখেনি। তারা আগের মতোই মিশে গেল অরিন্দমের সঙ্গে। এভাবেই কেটে গেল অনেকটা সময়। দিন যত কাটছিল আশাও যেন ফিকে হয়ে আসছিল। আচমকা, প্রায় দু'মাস পর বাড়িতে একটা খামবন্ধ চিঠি এল, একদিন বিকেলে। তখন অবশ্য সে বাড়িতে ছিল না। ফিরে আসার পর জানতে পেরেছিল একটা খয়েরি রঙের বড় খাম এসেছে। বুকের ভেতর ধুকপুক শুরু হলেও মনে হল সম্ভবত লিখিত পরীক্ষাটা উতরে যেতে পেরেছে। কারণ, পাশ না করলে এধরনের চিঠি আসারই কথা নয়। সাতপাঁচ না ভেবে টান মেরে খুলেই ফেলেছিল খামটা। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কাগজ। সেটাই আসলে ছিল নতুন জীবন শুরুর প্রথম পদক্ষেপ।

নিজের ঘরে ঢুকে আনন্দে প্রায় লাফাতে শুরু করেছিল অরিন্দম। জানত, শারীরিক পরীক্ষাটা তার কাছে সমস্যার হবে না। অন্য দশজনের চেয়ে এই বিষয়টায় অনেকটাই এগিয়ে সে। তার চিন্তার বিষয় ছিল এক এবং একমাত্র লিখিত পরীক্ষাটাই। সেই বাধা পেরিয়ে আসতে সমস্যা হয়নি। চিঠিতে উল্লেখ ছিল, কলকাতায় এসে ফিজিক্যাল এবং মেডিক্যাল টেস্ট দিতে হবে তাকে। সেটার জন্য পরের দিন থেকে ফের শুরু হল নতুন করে প্রস্তুতি।

দু'সপ্তাহ পর কলকাতায় আসতে হবে। কাজেই নিজেকে তৈরি করার পাশাপাশি মনের ভেতর একটা উত্তেজনা কাজ করছিল। বাড়ির লোকেরাও যেন একটু ভরসা পাচ্ছিলেন এই ধরনের প্রস্তুতি দেখে। অপেক্ষা শেষ হল একসময়। এসেই গেল সেইদিন। তবে যাওয়া আসার ঝক্কি কমাতে আগের দিন বিকেলেই একা চলে এল কলকাতায়। তারপর নিজের ওপর থেকে চাপ কমাতে সন্ধ্যাবেলা ঘুরতে ঘুরতে পৌঁছে গেল সল্টলেকে সেই চ্যানেলের অফিসের সামনে। কিন্তু আলো ঝলমলে অফিসটাতে ঢুকতে ইচ্ছে করল না একবারও। এদিক-ওদিক খানিকটা ঘোরাঘুরি করে তাড়াতাড়ি ঢুকে পড়ল মধ্য কলকাতার হোটেলে।

পরের সকালটা যেন সেই স্বপ্নপূরণের দিন। মাঠে হাজির হয়ে দেখল তার আসার আগেই শ'খানেকের বেশি চাকরিপ্রার্থী হাজির হয়েছে রেসকোর্সের মাঠে। তবে শারীরিক পরীক্ষায় দৌড়-সহ অন্যান্য কসরত দেখাতে তেমন কোনও অসুবিধে হল না। বাকি যারা এসেছিল, তাদের চেয়ে ঢের ভালো পরীক্ষা হল অরিন্দমের। তবুও নিজের ওপর অতিরিক্ত ভরসা করতে ভয় হচ্ছিল। বলা যায় না। শেষ মুহূর্তে অনেক কিছুই পরিবর্তন হতে পারে। আগে খবর করতে গিয়ে শুনেছে, পুলিশের চাকরির পরীক্ষায় নাকি অনেক কিছু ইধার-উধার হয়। তবু মনে একরাশ আশা নিয়ে, সেই রাতটা কলকাতায় কাটিয়ে, পরের দিন ফের রওনা দিল নিজের গ্রামের বাড়ির দিকে।

এবারও যেন অনন্ত প্রতীক্ষা। মনে টেনশন। এগোতে পারবে কি সামনের দিকে? নাকি, আবার ভাবতে হবে নতুন করে, নতুন কিছু।

দ্বিতীয় পরীক্ষাটা দেওয়ার পর বুক থেকে একটা পাথর সরে গিয়েছিল। কিন্তু অন্য একটা পাথর যেন চেপে বসেছিল। আসলে, পরীক্ষার বিষয়টা আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে জানাজানি হওয়ায় এটা কার্যত সম্মান রক্ষার লড়াই হয়ে দাঁড়াল। সুযোগ না পেলে বহু বাঁকা উক্তি যে উড়ে আসবে সেটা আন্দাজ করতে পারছিল অরিন্দম। চাকরি পাওয়ার জন্য একটা তরুণ যুবকের এইসময়ের মরণপন লড়াইটা আসলে কেউই মনে রাখে না। সবাই দেখতেও পায় না, রক্তাক্ত জীবনযুদ্ধটা।

বাইরের বন্ধুরা ছিলই, এসময়ে তার সবচেয়ে বড় বন্ধু হয়ে দাঁড়াল ফ্রয়েডের বই। বেশ কিছু মোটিভেশনাল বইও কিনে ফেলল সে। তারপর এক এক করে সবগুলি পড়া শুরু করল। পাশাপাশি খোঁজ নেওয়াও শুরু হল পরীক্ষার ফল কখন প্রকাশিত হতে পারে তার সম্ভাব্য তারিখ সম্পর্কে। যদি এই চাকরিটা না হয়, তাহলে বিকল্প কিছু তো দেখতে হবে। তার জন্যও প্রিপারেশনের প্রয়োজন। তবে সবটাই নির্ভর করছে ফলাফলের উপর।

প্রায় এক মাস ততদিনে পেরিয়ে গিয়েছে। বন্ধুদের সঙ্গে ঠেকে আড্ডা দিতে ব্যস্ত অরিন্দম। হঠাৎ করেই বেজে উঠল পকেটে রাখা মোবাইল ফোন। আজকাল সারা দিনে এই ফোনটা খুব একটা আওয়াজ করে না। সেদিন করল। বাড়িতে স্থানীয় পোস্ট অফিস থেকে একজন এসেছে। খয়েরি রঙের খামে একটা চিঠি এসেছে। কিন্তু পিওন ভদ্রলোক বাড়ির লোককে কিছুতেই চিঠিটা দিতে চাইছেন না। বাবা-মা বহুবার অনুরোধ করেছে। পরিচয়পত্রও দেখানো হলেও পিওনের মুখে এক রা। তাই বাড়ি থেকে সরাসরি তার মোবাইলে ফোন করে কথা বলিয়ে দেওয়া হয়েছে। অরিন্দম ওপারে কথা বলে জানতে পারল তাকে পোস্ট অফিসে যেতে হবে। নিজেকে সংগ্রহ করে আনতে হবে সেই চিঠি। উত্তেজনায় পিওনকে অরিন্দম বলেই ফেলল, 'আমি পোস্ট অফিসের কাছাকাছি রয়েছি। বাইকে চেপে চলে যাচ্ছি এক্ষুনি। আপনার সঙ্গে ওখানেই দেখা করে নিচ্ছি।'

সামনেই এক বন্ধুর বাইক ছিল। তাকে সামান্য অনুরোধ করতেই রাজি হয়ে গেল। দশ মিনিটের মধ্যে দু'জনে পৌছে গেল পোস্ট অফিসে। এবার অবশ্য উল্টে তাদেরই অপেক্ষা করতে হল। খানিকক্ষণ পর সাইকেল চালিয়ে ঢুকলেন পিওন। পরিচয়পত্র দেখার পর তিনি হাতে চিঠি দিলেন বটে, তবে আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন বকশিসের আশা করছেন। কেন বাড়িতে চিঠি দেননি, এবার বোঝা গেল আসল কারণ। পকেট থেকে মানিব্যাগ বার করে দেখা গেল তাতে দু'টো একশো টাকা রয়েছে। সেটাই তুলে দিল বৃদ্ধ পিওনের হাতে।

এবার চিঠি খোলার পালা। সামান্য একটা খাম ছিঁড়ে চিঠিটা বার করতেই যেন যাবতীয় শক্তি আর এনার্জি চলে গেল। হাত-পা কাঁপা শুরু হল। শেষ পর্যন্ত যাবতীয় দ্বন্দ্ব কাটিয়ে একটানে খুলে ফেলল খামের মুখ। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল একটা কাগজ। তাতে পড়া গেল মাত্র একটাই লাইন। যার মোদ্দা কথা, সে পুলিশে চাকরি করার যোগ্যতা অর্জন করেছে। আগামী সাতদিনের মধ্যে তাকে কলকাতা পুলিশের সার্জেন্ট পদের জন্য শিক্ষানবিশ হিসেবে প্রশিক্ষণে যেতে হবে।

শুধু একটা লাইন, ওই লাইনটা কোনওক্রমে পড়ার পরই চোখ দিয়ে বেরিয়ে এল জল। তারপর পুরো চিঠিটা কেমন যেন ঝাপসা হয়ে গেল। সাময়িক আবেগ সরিয়ে রেখে দাঁড়ানো বন্ধুকেই জড়িয়ে

ধরল সে। তারপর দু'জনে বাইকে বসে ফের বাড়ির পথে। ঘরে ঢুকতেই সামনে বাবা। তিনি বাইরে কোথাও যাচ্ছিলেন। ছেলে আনন্দে প্রণাম করতে গিয়ে জড়িয়ে ধরল তাঁকে। বাবাও জড়িয়ে ধরলেন ছেলেকে। দু'জনের চোখেই যখন আনন্দাশ্রু, ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে পড়েছে এলাকায়। প্রতিবেশীদের মধ্যেও অনেকে এসে গিয়েছেন বাড়িতে। মুহূর্তেই চাপটা কেটে গিয়ে যেন একটা হই-হই পরিবেশ। আজ আনন্দে প্রাণখুলে নাচতে ইচ্ছে করছিল অরিন্দমের, কিন্তু নিজেকে সংবরণ করল। এখনও বেশ কিছু কাজ বাকি রয়েছে। সবার আগে কলকাতা গিয়ে প্রশিক্ষণ পর্বটা ঠিকভাবে শেষ করতে হবে। বহু লোককে বহু প্রশ্নের জবাব দেওয়া এখনও যে বাকি।

# পুলিশ অরিন্দম



এক সপ্তাহের মাথায় যোগ দিতেই পাঠানো হল তাকে বারাকপুরে, সত্যিকারের পুলিশ তৈরি হতে। হঠাৎ করে একটা স্বপ্নপূরণ হয়ে যাওয়ায় মাঝে একটা সমস্যাও ঘিরে ধরছিল তাঁকে। আসলে, কোনও একটা চ্যালেঞ্জ নিয়ে তাতে সফল হয়ে গেলে সাময়িক তৃপ্তিটাই ভয়ঙ্কর ভাবে ফিরে আসে, কখনও কখনও। নিজের পরীক্ষার প্রস্তুতি পর্বে বেশ কয়েকজন বিখ্যাত মানুষের লড়াই করার ঘটনা, বইয়ে গল্পের আকারে পড়ে ছিল অরিন্দম। এবার সেটাই নিজের ক্ষেত্রে কাজে লাগলো। একরাতে ফাঁকা ঘরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই নিজেকে বোঝালো, সামান্য ছোটখাট ঘটনা থেকেই বড় ধরনের পদস্খলন হতে পারে। কাজেই যা করতে হবে তা যথেষ্ট ভেবেচিন্তে।

পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে গিয়ে দেখা গেল, বিষয়টা বেশ উপভোগ করার মতো। বোরিং কিছু নয়। তাছাড়া একসঙ্গে কলকাতা এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আসা সমবয়সী ব্যাচমেটরা বন্ধু হয়ে গেল খুব দ্রুত। সারাদিন ড্রিল আর আইনের কচকচানি শেখার পাশাপাশি রাতটা জমে যেত নানান আড্ডায়। বদমায়েশিতে যেন সব এক সে বড়কর, এক। প্রতিদিন একজন বা দু’জনকে বেছে নেওয়া হত র‍্যাগ করার জন্য। তবে পুরোটাই বেশ মজার। ভালো কাটছিল দিনগুলি।

ভালো এবং খারাপ সব কিছুই একটা সময় যেমন শেষ হয়, এক্ষেত্রেও তাই হল। শেষ হল তাদের ট্রেনিং পর্ব। এবার সবাইকে ডেকে নেওয়া হবে লালবাজারে। তারপর শুরু হবে ২০০৮ ব্যাচের প্রশিক্ষিতদের পুলিশ জীবন। অস্ত্র প্রশিক্ষণের প্রথম দিকে শুধু মনে হত, এই হাতেই একদিন টিভির বুম তুলে নিয়েছিল সে। আজ সেই হাতে বন্দুক। নিশানাও পাল্টে গিয়েছে, সঙ্গে আওয়াজটাও।

ট্রেনিংয়ের শেষ হওয়ার পর পুলিশ কমিশনারের সঙ্গে পরিচয় হওয়া এবং গায়ে সাদা পোশাক পরা একটা অন্য অনুভূতি। মনে হয়, নিজে থেকে দায়িত্ব ঘাড়ে চেপে বসেছে। পুলিশের পোশাকের ওজনটাও যেন একটু বেশি। একবার গায়ে চাপালে নিজেকে কেমন বড় বড় মনে হয়। সাধারণ মানুষ এই সাদা উর্দিকে একটু বেশিই ভয় করে।

চাকরির প্রথম দিকে অনেক কিছু জানলেও একটু চুপ করে থাকাই দস্তুর। অন্য যারা এই ব্যাচে পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েছিল, তাদের থেকে অরিন্দম কোথাও যেন একটু এগিয়ে। আসলে, পুলিশের চাকরির সাধারণ যে জ্ঞান, তা সাংবাদিকতার সূত্রে আগেই সে অর্জন করেছিল। ফলে কিছু সূক্ষ্ম ব্যাপারে এই কারণেই অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকতে কোনও অসুবিধে হয়নি। বিশেষ করে ,ঘটে যাওয়া অপরাধের ক্ষেত্রে কোন আইন, বা তার প্রয়োগ কেমন হবে, সেটা বোঝার বিষয়ে

অরিন্দমের অনেকটা এগিয়ে থাকা শুরুতেই বড়কর্তাদের নজরে পড়ল। প্রথমবারের মেপে নেওয়া থেকেই তাঁরা ঠিক করলেন দক্ষতা অনুযায়ী সদ্য কাজে যোগ দেওয়া অফিসারদের বিভিন্ন জায়গায় পোস্টিং দেওয়া হবে।

পুলিশে কাজ শুরু করে দিলেও অরিন্দম কাউকে নিজে কখনও বলেনি যে, তার সাংবাদিকতার অভিজ্ঞতাও রয়েছে। জয়েন করার পর তার প্রথম পোস্টিং হল টালা থানায়। সেখানকার ওসি তখন নবকুমারবাবু। এলাকার বিভিন্ন আইনশৃঙ্খলা রক্ষার কাজে তিনি অরিন্দমকে পাঠানো শুরু করলেন, অপেক্ষাকৃত জুনিয়র হিসেবে বিষয়গুলিতে অভিজ্ঞতা বাড়ানোর সুযোগ দিতে। এরকমই একটা কাজে গিয়ে একদিন অরিন্দমের কানে এল, একটি রাজনৈতিক দল আরজি কর হাসপাতাল ভাঙচুর করার পর থানার ওসিকে হেনস্থা করা চেষ্টা করবে। সঙ্গে সঙ্গে নিজেই সিদ্ধান্ত নিয়ে পৌছে গেল থানায়। নববাবুকে বিষয়টি বলতেই তিনি ঠাট্টার সুরে বললেন, ‘কোথা থেকে যে খবর পাও, ওরা থানায় আসবে কেন?’ নিজের হেনস্থা হওয়াটা প্রাথমিক ভাবে সামলে নিল সে। আচমকা, পনের মিনিটের মধ্যে পালটে গেল গোটা পরিস্থিতি। ম্যাটাডোর করে কয়েকশো মহিলা হাজির হলেন থানার সামনে। তারপর কোনও বাধা না পেয়ে ঢুকে পড়লেন থানা চত্বরে। ততক্ষণে হুড়মুড়িয়ে বেড়িয়ে এসেছেন নববাবু-সহ জনা পাঁচেক অফিসার। বাকিরা তখন এলাকায়। কেউ তদন্তের কাজে, তো কেউ আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ব্যস্ত।

থানার মূল ভবনে ঢোকার ঠিক মুখে সিঁড়িতে ওসি এসে দাঁড়ালেন। দ্রুত তাঁর দিকে এগিয়ে এলেন বিক্ষোভকারী মহিলারা। অবস্থা বেগতিক দেখে অরিন্দম দৌড়ে গিয়ে নবকুমারের দিকে ফিরে সিঁড়িতে নিজের পা উল্টোদিকে ঠুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল বিক্ষোভকারীদের দিকে। ওই রাজনৈতিক দলের সদস্যরা তাকেই সামনে পেয়ে টেনে পোশাক ছিঁড়ে দিল প্রথমে। তারপর ব্যাপক ভাবে মারধর শুরু হল। ওসি সেই সুযোগে নিজের চেম্বারে দৌড়ে ঢুকে ফোন করে আরও বেশি ফোর্স পাঠাতে বললেন লালবাজার কন্ট্রোলরুমে। বেশি সময় লাগল না, মিনিট দশেকের মধ্যে এইচআরএফএসের একটি টিম হাজির হল সেখানে। সংখ্যায় আরও বেশি পুলিশ ঢুকতে দেখে আহত অরিন্দমকে ফেলে রেখে পালালো বিক্ষোভকারীরা। জুনিয়র এক অফিসারের এই সাহসিকতার খবর পৌছে গেল লালবাজারের বড়কর্তাদের কানে।

এর কিছুদিনের মধ্যে ঘটল দ্বিতীয় আরও একটা ঘটনা। তৃণমূল কংগ্রেসের ডাকে ২১ জুলাইয়ের সমাবেশ। থানা থেকে অরিন্দমকে আনা হল সেন্ট্রাল এভিনিউয়ে। সেখানে তার সঙ্গে একজন মাত্র পুলিশ কর্মীকে দিয়ে দায়িত্ব দেওয়া হল, মিছিল সামলানোর। সারাদিন ক্লান্তিকর কাজের শেষে খোঁজ পড়ল তার। লালবাজারে ডেকে পাঠিয়েছেন ডিসি (আরএফ) গজমেঢ় সাহেব। সকাল থেকে মিছিল সামলে এমনিতেই অবিন্যস্ত পোশাক। কোনও ক্রমে প্যান্টের মধ্যে জামা গুঁজে হাজির হল লালবাজারে। ডিসির ঘরে ঢুকে একটা বড় স্যালুট দেওয়ার পর সাহেব বললেন, ‘ওয়েল ডান। তুমি আজ প্রায় একা স্পটে যেভাবে ডিউটি করেছো, তা তারিফ করার মতো। এভাবে কাজ করতে হবে।’ কোনও কাজের প্রশংসা পেলে উৎসাহ অনেকটাই বেড়ে যায়। এক্ষেত্রেও তা-ই হল। দু’একজনের

মাধ্যমে খবর এল, তার সাহসিকতা নিয়ে সাহেবদের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে। যদিও মনটা ভেঙে যেতে বেশিদিন সময় লাগল না। একমাসের মাথায় তাকে বদলি করে দেওয়া হল ওয়্যারলেস বিভাগে।

কিছুদিন সেখানে কাজ করার পর কানে এল লালবাজারে নতুন বিভাগ এসটিএফে বাছাই করে কিছু অফিসার নেওয়া হবে। গত কয়েক বছর ধরেই কলকাতা শহর এবং শহরতলীকে কেন্দ্র করে জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের শাখা-প্রশাখা বিস্তার করেছে। ঢুকছে ইন্ডিয়ান মুজাহিদিনের মতো জঙ্গি সংগঠনের সদস্যরা। আর এই সংগঠনের জন্মের সঙ্গে কলকাতার একটা যোগও রয়েছে। ২০০১ সালের ২৫ জুলাই খাদিম কর্তা পার্থ রায়বর্মণ অপহরণ এবং আমেরিকান সেন্টারের সামনে জঙ্গি হামলার ঘটনায় জানা গিয়েছিল এখানে কীভাবে ডেরা তৈরি করছে ওই সংগঠনগুলি। শহরে জঙ্গি দমনে রাজ্য সরকার তখনই সিদ্ধান্ত নেয়, এদের কাজকর্মের ওপর নজরদারি করার জন্য উত্তরপ্রদেশ পুলিশের আদলে এখানেও একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে।

সেই কাজ শুরু হতে হতে কয়েক বছর সময় কেটে যায়। তার আগের বছর, অর্থাৎ ২০০৮ সালে বেশ কিছু নতুন কম বয়সী অফিসার নিয়ে কলকাতা পুলিশে চালু হয় স্পেশাল টাস্ক ফোর্স অর্থাৎ এসটিএফ। ওই বিভাগে নতুন যুগ্ম কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয় সিনিয়র আইপিএস রাকেশ কুমারকে। এবার তিনি নিজের মতো করে সেই বিশেষ দল তৈরি করা শুরু করেন। যেখানে দক্ষ এবং বিশেষ প্রশিক্ষিত অফিসারদের নেওয়া হবে বলে সিদ্ধান্ত নেন লালবাজারের কর্তারা। সেই অনুযায়ী দ্বিতীয় ব্যাচের জন্য বাছাই পর্ব শুরু হয়। সার্জেন্ট হলেও অরিন্দম প্রথম থেকেই কর্তাদের নজরে পড়ে গিয়েছিল। ফলে তাকে প্রাথমিক দলে যুক্ত করে নেওয়া হল। যাদের বিশেষ ভাবে প্রশিক্ষণ দিয়ে তারপর নেওয়া হবে সেই চূড়ান্ত দলে। বলতে গেলে, অনেকটাই স্বাধীন ভাবে কাজ করার সুযোগ পাবে এই দলের সদস্যরা। রাজ্য সরকারও চাইছিল এই দলটাকে শক্তিশালী করে তুলতে, যাতে একটা নির্ভরশীল বাহিনী গড়ে তোলা যায়। অরিন্দম দেখল, ওর মতো আরও প্রায় কুড়ি জন যুবককে নেওয়া হয়েছে সেখানে। যাদের মধ্যে থেকে বাছাই করা চারজন যাবেন চূড়ান্ত বিভাগে। এবারে শুরু হল নতুন করে প্রশিক্ষণ। এখানে সুযোগ পেয়ে নিজেকে একদম নতুন করে মেলে ধরার সুযোগ পেয়ে গেল সে। কীভাবে জঙ্গিদের ফলো করতে হয়, তাদের মধ্যে সোর্স নেটওয়ার্ক বাড়ানোর কৌশল, বিস্ফোরক নিস্ক্রিয় করতে হয় কীভাবে। সবই শেখা গেল এখান থেকে।

দিন পনেরোর প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করার পর একটি তালিকাও প্রকাশিত হল। দেখা গেল তাতে মোট চারজনের মধ্যে নাম রয়েছে অরিন্দমের। মাত্র কয়েকমাসের ব্যবধানে দু’দুটি সাফল্য মনে জোর এনে দিল অনেকটা। তবে নিজের অজান্তে সেই চাপটা যেন স্থায়ী ভাবে বসে গেল, আমাকে সফল হতেই হবে। কলকাতা পুলিশের চাকরিতে অরিন্দম ট্র্যাফিকের সার্জেন্ট হিসেবে যোগ দিলেও তা আইনত তদন্তকারী অফিসারের পদমর্যাদার মধ্যে পড়ে না। কিন্তু তাকে বিশেষভাবে এসটিএফে যুক্ত করা হল, তদন্ত নয়, বড় এবং কঠিন অপারেশনে ব্যবহার করার জন্য।

কে যেন বলেছিলেন, 'সাফল্য পাওয়া কঠিন। কিন্তু আরও কঠিন, তা ধরে রাখা।' সেটাই আপাতত নিজের জীবনের আপ্তবাক্য হিসেবে ধরে নিল সদ্য পুলিশে যোগ দেওয়া এক তরুণ। যেটা পেয়েছে, সেটাকে সঠিক পথে চালিত করতে হবে। আসলে, অন্য চাকরি করতে গেলে অভিজ্ঞতা একটু অন্য রকমের হয়। এখানে রোজ লালবাজারে ঢুকে মনে হত একটা মন্দিরে ঢুকেছে। আর সেই মন্দির থেকে বেরিয়ে সাধারণ মানুষের কাজে লাগতে পারলে, নিজের বুকের ছাতিটা এক ধাক্কায় অনেকটাই বেড়ে যায়। নতুন এই চাকরির সুবাদে নিজের এলাকাতেও তার কদর বেড়ে গেল।

তবে ছুটির দিন ছাড়া বেশির ভাগ দিনই কাটানো শুরু হল কলকাতায় পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে। আরও কেউ কেউ, যারা জেলার ছেলে হলেও কর্মসূত্রে এই শহরে, তারা সবাই বাড়িভাড়া নিয়ে নিলেন। মাঝে মাঝে দলবেঁধে বেড়াতে যাওয়া বা নিজেরা রান্না করে খাওয়া-দাওয়াও চলত একসঙ্গে। ঘুরতে ঘুরতে শহরটাকেও চেনা হয়ে যাচ্ছিল অরিন্দমের। কারণ, আগে বহুবার কলকাতা এলেও এভাবে খোলামনে শহরটাকে কখনও দেখা হয়নি। রাতে ঘরে ঢোকার আগে বাইরে খেয়ে ফেরাটাও হত মাঝেমধ্যে। এমনি করেই একদিন রাতে ঘটে গেল সেই ঘটনাটা। বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ধরে গনেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের দিকে যাওয়ার পথে দেখল মোড়ে একটা জটলা। কাছে গিয়ে বোঝা গেল, একটি প্রেস স্টিকার লেখা গাড়ি লাল সিগন্যাল ভেঙে এগিয়ে যাওয়ার সময় কর্তব্যরত ট্রাফিক কনস্টেবল তা আটকে দিয়েছেন। গাড়ি থেকে নেমে এসেছেন আরোহী। তিনি মানতে রাজি নন, আইন ভেঙেছেন বলে। তা নিয়ে নিয়ে শুরু হয়েছে ঝামেলা। পকেট থেকে নিজের প্রেস কার্ড বার করে রীতিমতো তড়পাচ্ছেন গাড়ি থেকে নেমে আসা ব্যক্তি। নিজের পরিচয় দিয়ে বোঝাতে চাইছেন, তাঁর গাড়ি যেন ছেড়ে দেওয়া হয়। অরিন্দম কৌতূহলবশত সেখানে গিয়েছিল। ভিড় ঠেলে একদম সামনে গিয়ে গাড়ি থেকে নেমে আসা ব্যক্তিকে দেখে আচমকা মাথাটা কেমন যেন ঘুরে গেল। মুখ থেকে অস্ফুটে বেড়িয়ে এল—'আরে! আবার তিনি! এর সঙ্গেই তো হিসেব বুঝে নিতে চাই আমি।'

দু'পক্ষের বচসা কোনও মতেই থামছিল না। কেউ কারও বক্তব্য থেকে সরে আসতে রাজি নয়। ততক্ষণে খবর পেয়ে সেখানে চলে এসেছেন কর্তব্যরত সার্জেন্টও। তাঁকে পুরো ঘটনাটি বুঝিয়ে বললেন ওই ট্রাফিক কনস্টেবল। সব শুনে, নিজের বাইকটা সাইডে রেখে খানিকটা হেঁটে এসে সার্জেন্ট সরাসরি বললেন, 'আপনি যেই হোন না কেন, আপনার গাড়ি ছাড়া হবে না। বেশি তর্ক করলে সব কেস জুড়ে দেওয়া হবে। এবার নিজেই সিদ্ধান্ত নিন কী করবেন?' পুলিশের রগরানিতে দেখা গেল অনেকটাই কাজ হয়েছে। গাড়ি থেকে নেমে আসা প্রেস কার্ড দেখানো ব্যক্তি ততক্ষণে মিনমিন করে বলা শুরু করেছেন, 'দেখুন না একটু, যদি ছেড়ে দেওয়া যায়?' বেশ মজা লাগছিল অরিন্দমের।

কিছু কিছু লোক আসলে এরকমই। তারা দুর্বলদের পেলেই নিজেকে শক্তিশালী ভাবা শুরু করেন। এতক্ষণ যিনি চমকাচ্ছিলেন, তিনি আসলে নিজেকে ভাবছিলেন ভিআইপি। সাদা পোশাকধারী এক পুলিশের ধমকে নেমে এসেছেন একদম সাধারণ নাগরিকে। হয়তো সামান্য এই বিষয়টা এড়িয়ে চলে যাওয়া যেত। মন সায় দিল না। এক্ষেত্রে অবশ্য মনের কোনও দোষ নেই। তবে ঝামেলাটা যাতে

তাড়াতাড়ি মিটে যায় সেজন্য এগিয়ে গেল সে। ওয়াকিটকিতে কথা বলতে থাকা সার্জেন্টের পাশে দাঁড়িয়ে বলল,'আমিও পুলিশের স্টাফ। ২০০৮ ব্যাচের সার্জেন্ট। তবে এজন্য আপনার কাছ থেকে বাড়তি কোনও সুবিধা চাই না। শুধু অনুরোধ, ওই ব্যক্তিকে আমি ব্যক্তিগত ভাবে চিনি তাই মুখের ওপর একটা কড়া থাপ্পড় দিতে চাই। সেই সুযোগটা যদি আমাকে দেওয়া হয়।' 'আপনি ওনাকে চেনেন নাকি? তবে মারধর করবেন না কিন্তু'—জানতে চাইলেন সার্জেন্ট।

'হুম, শুধু দেখুন'— জবাব এল অরিন্দমের কাছ থেকে। এবারে এগিয়ে গেল সে। একেবারে সামনে গিয়ে গাড়ির আরোহীকে বলল, 'দেখুন তো আমাকে চিনতে পারেন কি না? অবশ্য, চিনতে না পারারই কথা। আপনাদের মতো লোকেরা ক্ষমতার অপব্যবহার করতে এক্সপার্ট। তারা আর চিনবে কী করে?' ততক্ষণে অরিন্দমকে দেখে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছেন তার প্রাক্তন সম্পাদক—'আরে, তুমি! পুলিশে চাকরি করছো? বেশ ভালো। আমি জানতাম তোমার উন্নতি কেউ আটকাতে পারবে না।' লোকটার প্রতি এতক্ষণ ঘৃণা হচ্ছিল তার। এখন করুণা হল। এরা ভাঙে, মচকায় না। তবু নিজেকে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে রেখে অরিন্দম ঠান্ডা গলায় জবাব দিল, 'আমার সঙ্গে আপনি যা ব্যবহার করেছেন, আমি তা করব না। আপনাকে শুধু বুঝিয়ে দেব, ভদ্র আর অভদ্র লোকের মধ্যে ফারাকটা।' এবার কার্যত ভেঙে পড়লেন তার প্রাক্তন সম্পাদক। কাতরস্বরে বললেন, 'প্লিজ, তুমি একটু দেখো। সম্মানের বিষয় এটা।' একটা তির্যক হাসি হেসে ওই সার্জেন্টের সঙ্গে আলোচনা করে গাড়িটা ছেড়ে দিল সে। অরিন্দমের বিবেক বলল, প্রথম রাউন্ডের এই লড়াইটাতে জিতে গিয়েছে সে। সবার সামনে যেভাবে ভদ্রলোক তাকে অনুরোধ করল সেটাই তার কাছে বিরাট পাওনা।

লালবাজারে যারা নতুন চাকরি করতে আসেন, তাদেরও অন্য পাঁচটি পেশার লোকেদের মতো নিজেকে প্রমাণ করতে হয়। আসলে, সব জায়গাতেই তো প্রতিযোগিতা চলে। এখানে অন্যদের চেয়ে সবক্ষেত্রে কতটা এগিয়ে থাকতে পারেন একজন, তাই নিয়ে শুরু হয় লড়াই। তবে সেটা বেশ স্বাস্থ্যকর। একটা তদন্তে কীভাবে এগোতে হয়, একজন অভিযুক্তের থেকে বয়ান আদায় করতে হয় কেমন করে, কীভাবে সোর্স তৈরি করতে হয় এবং সোর্সের থেকে সঠিক সময়ে আসল তথ্য জোগাড় করে আনাই একজন নতুন পুলিশ কর্মীর উৎকর্ষ প্রমাণ করে। অরিন্দম যেহেতু একসময় সাংবাদিকতা করেছে, স্বাভাবিক নিয়মে তার সুবিধা অন্যদের থেকে অনেকটাই বেশি। কারন, সাংবাদিকতা এবং পুলিশের চাকরি দুটি ক্ষেত্রে আক্ষরিক অর্থে সেই মাস্তান, যার সোর্স নেটওয়ার্ক অন্যদের তুলনায় বেশি। একে মুর্শিদাবাদে বাড়ি, তাতে সাংবাদিকতা করার জন্য গোড়া থেকেই জঙ্গি সংগঠনগুলি নিয়ে বাড়তি পড়াশুনো ছিল তার। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের শীর্ষকর্তা দীর্ঘদিন খোঁজখবর নেওয়ার পর জানতে পারলেন অরিন্দমের এই বিষয়ে দক্ষতার কথা। তাই প্রথমেই তাকে দায়িত্ব দেওয়া হল এক লস্কর জঙ্গিকে ট্র্যাক করার। মানে, ওই জঙ্গির প্রতিটি পদক্ষেপে নজরদারি করতে হবে। সে কোথায় যাচ্ছে, কী করছে, জানাই শুধু নয়। কার কার সঙ্গে সম্পর্ক গড়েছে সেই বিস্তারিত তথ্যও জানতে চায় লালবাজার। প্রয়োজনে সেই জঙ্গিকে চুপচাপ তুলে নিতে হবে নিজেদের জালে। তাহলে, এ রাজ্যে নতুন ডেরা বাঁধতে চলা ওই জঙ্গি সংগঠনে বড়সড় ধাক্কা দেওয়া যাবে।

নিজের মতো করে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করল অরিন্দম। বিভিন্ন সূত্রে জানতে পারল, সবে বাংলাদেশ পেরিয়ে ওই জঙ্গি এপারে ঢুকে বসিরহাটে একজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর শুরু করেছে, কলকাতায় নেটওয়ার্ক তৈরির চেষ্টা।

এই শহর বহুদিন ধরেই জঙ্গি সংগঠনগুলির কাছে সেফ করিডর হিসেবে পরিচিত। ফলে এই কলকাতাকে তারা নিজেদের নিশানায় খুব একটা রাখে না। কিন্তু এখানে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকা থেকে শুরু করে অন্য রাজ্যে চলে যাওয়ার কাজে কলকাতাকে ব্যবহার করা আর নতুন বিষয় নয়। ওই জঙ্গিও সম্ভবত সেই চেষ্টাই করছে। একদিন ভোরে বড়কর্তাদের জানিয়ে বসিরহাটে রওনা হয়ে গেল সে। একা একা। তারপর খানিকটা উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরতে ঘুরতে পৌছে গেল সীমান্তের কাছাকাছি। গিয়ে বসল,এলাকার একমাত্র চায়ের দোকানটায়। যে কোনও বর্ডারে এই চায়ের দোকানগুলি একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। ওই এলাকার সব খবরাখবরই শুধু নয়, স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্পর্কে সব তথ্য জানা যায়। কারও বাড়িতে নতুন লোক এলেও জানা যায় দোকানের খদ্দেরদের আলোচনা থেকেই। অরিন্দম দোকানে ঢুকে প্রথমেই একটা চায়ের অর্ডার দিল। নতুন মুখ দেখে দোকানদার একটু অবাক চোখে তাকিয়ে জানতে চাইলেন, 'ভাইয়া কি এখানে কারও মেহমান নাকি?' গ্রামের ছেলে হলে ভাষার সমস্যা খুব একটা হয় না। একটা বোকাবোকা সুলভ মুখ নিয়ে খানিকটা মুচকি হেসে সে জবাব দিল, 'আসলে আমার এক দোস্তের মেহমান একজন ওদিক থেকে এসেছে। সে কোথায় গেল তাকে খুঁজতে এসেছি। সঙ্গে করে নিয়ে যাব।' দোকানদার উত্তর দিল,'আজ্ঞে। তা একটু দাঁড়ান আরও কয়েকজন আসুক দেখি।' অরিন্দমের মনে হল, ও যে একজনের খোঁজ করতে এসেছে তা জানাজানি হয়ে গেলে সমস্যা বাড়বে। তার শিকার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে প্রসঙ্গটা ঘুরিয়ে দেওয়া যাক। কথাটা ভাবামাত্র পকেট থেকে মোবাইল ফোন বার করে এক বন্ধুর নম্বরে মিসড কল দিল। উল্টোদিক থেকে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কল এল। কিন্তু কানে ফোন দেওয়ার ফাঁকেই কলটা কেটে দিল সে। তারপর, যাতে অন্যরা শুনতে পায় এমন ভাবে বলে উঠল, 'ও, আচ্ছা তাহলে পৌছে গেছে। তাই বলো। আমি তো এখানে ঘুরে ঘুরে পাচ্ছিলামই না। একটা চায়ের দোকানে এসে তাই কথা বলছিলাম। যাক, এখন নিশ্চিন্ত।

তাহলে খানিকটা সময় এখানে কাটিয়ে তারপর ফিরব। তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই।' এমনিতেই কলকাতার মতো হইচই নেই ওই সব এলাকায়। কাজেই সবাই শুনতে পেলেন এপাশ থেকে কী বলা হল। পাশের বাড়ির সমস্যাকেও নিজের বলে ভেবে নেওয়া গ্রামের লোকেদের একটা অভ্যাস। চা খেতে খেতে এক খদ্দের বললেন, 'দেখেছো কাণ্ড! আরে, মোজাম্মেলও সেদিন বলছিল, ওর বাড়িতে একজন এসেছে ওপার থেকে। তাকেও নাকি একজনের নিতে আসার কথা। অথচ তিনদিন হয়ে গেল আসেনি। তাও তো আপনি ভালো লোক। নিজের লোকের খোঁজে চলে এসেছেন।' অরিন্দম জানতে চাইল, 'মোজাম্মেলের ঘর কি আপনার বাড়ির পাশেই?' গ্রামের সরল লোকটি জবাব দিলেন, 'তা নয়ত কি?' কথা বলতে বলতে ওই ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। বোঝা গেল সামনের দাঁড় করানো সাইকেলটি তাঁর।

‘না মিয়াঁ, আজ যাই। মনে হয় সব বিকেলে আসবে। অনেকক্ষণ বসলাম।’ সাইকেলের দিকে এগোতে এগোতে বললেন তিনি। এই ধরনের একটা সুযোগের জন্য ওত পেতে ছিল অরিন্দম। তড়াক করে বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে, এবার সে বলল, ‘কলকাতা থেকে ট্রেনে চেপে এতদূর এলাম। কাজ না হয় নেই। তা বলে আপনাদের পানিতৌড় গ্রামটা একবার ঘুরে দেখব না তা কী করে হয়? চলুন, আপনার সঙ্গে একটু এদিক-ওদিক গ্রামটা ঘুরে দেখি। আমাদের মতো শহরের লোকেদের সেই সুযোগ কোথায়?’ ভদ্রলোক রাজি হয়ে গেলেন। দু’জনে বেরিয়েও গেলেন সাইকেলে চেপে। গল্পে গল্পে জানা গেল তাঁর নাম শেখ রশিদ।

ঘণ্টাখানেক ঘোরাঘুরির পর অরিন্দম ইচ্ছে করেই বলে ফেলল, ‘ভীষণ ক্লান্ত লাগছে। কোথাও একটু বিশ্রাম নিলে ভালো হতো।’ যেন এই কথাটা শোনার জন্যই অপেক্ষা করছিলেন রশিদ। সাইকেলের সামনে বসেই বললেন, ‘কোথায় আর যাবেন? চলুন বাড়িতে। চারটে মুখে দেবেন কিছু। আমার বাড়িতে পাখাও আছে। অসুবিধা হবে না।’ প্রথম দিকে কায়দা করে একটু আপত্তি তুললেও পরে আর মানা করার ঝুঁকি নিল না সে। সাইকেলে চেপে সোজা চলে গেল রশিদের বাড়িতে।

ইট গেঁথে তৈরি করা থাকলেও তাঁর বাড়িটিকে ঠিক পাকা বাড়ি বলা যায় না। বড় দু’টো ঘরে প্লাস্টারের চিহ্ন নেই। ছাদগুলিও অ্যাডবেস্টর্স দেওয়া। বাড়িতে তিনি ছাড়া স্ত্রী রয়েছেন। একমাত্র ছেলে কলকাতাতে বউবাজারে চাকরি করে। দু’তিন মাস পর পর বাড়ি গিয়ে বাবা-মাকে সংসার খরচ দিয়ে আসে। এ সবই ঘরে বসে বসে শুনতে হচ্ছিল অরিন্দমকে। ইচ্ছে না থাকলেও কিছু করার নেই। মন দিয়ে এ সব না শুনলে নিজের আসল কাজটাই হবে না। আগে এদের বিশ্বাস অর্জন করতে হবে। বাড়ির মালিকের কথা শুনতে শুনতে ঠান্ডা জল এল। তারপর চা। বাড়ির মালকিন একদম সাদামাটা গৃহবধূ। তিনি অদ্ভুত গ্রাম্য টানে জানালেন, ‘দুপুরে না খেয়ে যাবেন না কিন্তু। আমি রান্না বসিয়ে দিয়েছি।’ গ্রাম নিয়ে গল্পেই কেটে গেল আধঘন্টা। এবার অরিন্দম মুখ ফুটে রশিদকে বলল, ‘একটু সিগারেট খেতে যদি বাইরে যাই। আপনাদের অসুবিধে হবে?’ লজ্জায় প্রায় নুইয়ে পড়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, ‘আরে, ছি, ছি। তা কেন হবে? আপনি ঘরেই খান না, আমাদের কোনও সমস্যা হবে না।’

অরিন্দম আসলে এটা চায় না। সে বলে উঠল, ‘যারা সিগারেট খায় না, তাদের ধোঁয়াতে সমস্যা হয়। আমি সেটা জানি। তাই বাইরে খেয়ে আবার চলে আসছি।’ রশিদও ছাড়ার পাত্র নন। মুচকি একটা হাসি দিয়ে জবাব দিলেন, ‘তা খাই বটে। সিগারেট আর কিনব কোত্থেকে। তাই বিড়ি খাই।’ ‘তাহলে আসুন দু’জনেই সিগারেটে টান দিই।’ ভদ্রলোককে এবার বাইরে প্রায় বাড়ির গেটের কাছে নিয়ে গেল অরিন্দম। দ্বিতীয় পর্বে শুরু হল নানা কথা। দেশের-দশের। কথায়-কথায় এবার সে বলেই ফেলল, ‘ওটাই কি মোজাম্মেলের বাড়ি? উনি কি বাড়িতে আছেন? আপনার সঙ্গে সম্পর্ক কেমন?’ গ্রামের লোকেরা সহজ-সরল হওয়ায় একটা সমস্যাও রয়েছে। একটা প্রশ্ন করলে, তারা দশটা প্রশ্নের জবাব দিয়ে দেন। আর এবার করা হয়েছে তিনটি প্রশ্ন। ফলে রশিদ প্রায় পনেরো মিনিট ধরে সিগারেটে সুখটান দিয়ে বোঝাতে শুরু করলেন, তিনি গ্রামে কতটা জনপ্রিয়। তাঁকে সবাই কতটা

মানে। এবং পাশের বাড়ির সঙ্গে ঠিক কতটা সুসম্পর্ক বজায় রেখেছেন। একটা সময় সে সব কিছু প্রাণপনে বোঝাতেই ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের দাবির সত্যতা বোঝাতে একসময় অরিন্দমের হাত ধরে কার্যত টেনে নিয়ে গেলেন পাশের বাড়ি। বাইরে থেকে হাঁক দেওয়া শুরু করলেন, 'মিয়াঁ ও মিয়াঁ, বাড়িতে আছো নাকি?' লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা এক ব্যক্তি একপা-দু'পা করে এগিয়ে এলেন দরজার দিকে। 'কী খবর হে—এত হাঁকাহাঁকি করছ কেন?' যেন খানিকটা বিরক্ত হয়েই জানতে চাইলেন। পাশে দাঁড়ানো রশিদ ততক্ষণে আরও উৎসাহিত। বলেই ফেললেন, 'তোমার বাড়িতে নতুন মেহমান। আর আমার বাড়িতেও। তা উনি গেলেন কোথায়?'



অবস্থা সামাল দিতে এগিয়ে আসতে হল অরিন্দমকে। 'আরে না, না, বাড়িতে অতিথি এসেছে তাকে শুধু শুধু কেন ডাকতে যাবেন? তার চেয়ে চলুন, আপনার বাড়িতেই এক কাপ চা খাই।' এই কথাতে পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হল। তবে যার বাড়িতে আসলে সে এসেছিল, তিনি একটু থম মেরে গেলেন। শুধু একবার বলার চেষ্টা করলেন, 'মানে, আমার স্ত্রী তো রান্না বসিয়ে দিয়েছে। এতক্ষণে হয়ত হয়েও গিয়েছে।' কিন্তু কে শোনে কার কথা!

নিজেই যেচে চা খাওয়ার নেমন্তন্ন নিয়ে অরিন্দম হাঁটা লাগাল ওই বাড়ির অন্দরে। তার সন্দেহ ততক্ষণে আরও দৃঢ় হয়েছে এজন্য যে, পাশের বাড়ির ভদ্রলোক মুখ ফসকে একবার বলেই ফেলেছেন, তাঁর বাড়ির অতিথি নতুন, তাই খুব একটা ঘর থেকে বেরোচ্ছেন না। ওটাই খটকা লেগেছিল, পুলিশের কানে। আসলে, কথা বলার ফাঁকে ভিতরে ঢুকে,ওই বাড়ির ইতিহাস-ভূগোল সব জেনে নিতে চাইছিল অরিন্দম। বাহানাটা খেটেও গেল ঠিকঠাক। দেখা গেল, বেশ সম্ভ্রান্ত পরিবার। বাড়ির কর্তা বললেন, তিনি নাকি ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা করেন। ওপারেও ব্যবসা সূত্রে নিয়মিত যাতায়াত রয়েছে তাঁর। কেন জানা নেই, তবে অরিন্দমের মনে হল, প্রথম চেষ্টাতেই ঠিক পুকুরে চারা ফেলতে পেরেছে সে। এবার আরও খানিকটা তথ্য সংগ্রহের প্রয়োজন। তাহলেই কাজ অনেকটা এগিয়ে যাবে। বাড়িটাতে দু'পাশে মোট পাঁচটি ঘর। সবচেয়ে ছোট ঘরটি বাঁদিকে এক কোণায়। অন্য সবগুলি থেকে দূরে। চোখে পড়ল, সবক'টি ঘরের দরজা খোলা থাকলেও ওই ছোট ঘরটির দরজা বন্ধ। বিষয়টা যাচাই করে দেখার জন্য অরিন্দম ইচ্ছে করেই বলল, 'আপনাদের বাড়িতে প্রচুর ঘর দেখছি। আমাদের বাড়িতে এর অর্ধেক ঘরও নেই। তো, ওই ছোট ঘরটা কি গোডাউন হিসেবে ব্যবহার করেন?' পাশের বাড়ির অতিথির এত প্রশ্নে খুশি হলেন না বাড়ির কর্তা মোজাম্মেল। মুখ দেখে সেটা বেশ বোঝা গেলেও, বুঝতে দিলেন না প্রশ্নকর্তাকে। বরং স্বাভাবিক ভাবেই জবাব দিলেন, 'ওই আর কী, ও ঘরে মেহমানরা এলে থাকেন।'

যতই ছদ্মবেশ ধরে থাকুক না কেন, পুলিশ তো পুলিশই।

চা খেতে দেওয়া হলেও অরিন্দম বারবার নজর রাখছিল ওই ছোট্ট ঘরটাতে, সেখানে আদৌ চা পৌছে দেওয়া হয় কি না। কিন্তু দেখা গেল, চায়ের কাপ হাতে সেদিকে কেউ গেলেন না। এক ফাঁকে গৃহকর্তা এবং গৃহকত্রীর মধ্যে চোখে চোখে যে কথা হল, তা দেখতে ভুল করল না পুলিশের চোখ। ফলে বিষয়টা বুঝে নিতে বেশি সময়ও লাগল না। যার জন্য এতদূর থেকে কষ্ট করে আসা, এবারে মনে হল, হয়তো ঠিক দরজারই চাবি পাওয়া গিয়েছে।

এসব জায়গায় বেশি কথা বললে সন্দেহ বাড়ার সম্ভবনা। কাজেই দ্রুত চা খেতে খেতে তার প্রতি যাতে কোনও সন্দেহ না হয়, সেজন্য পরিবেশটা হালকা করার জন্য বলে উঠল, 'একবার আমারও ওপারে যাওয়ার ইচ্ছে। অথচ পাসপোর্টটাই করানো হয়নি। কতজন যে ওপারে অপেক্ষা করে আছেন, কী আর বলব?' কথাটা সঙ্গে সঙ্গে লুফে নিলেন এই বাড়ির গৃহকর্তা। জানতে চাইলেন, 'আপনি কলকাতার কোথায় থাকেন? যেতে চাইলে বলবেন। আমার জানাশোনা আছে। দু'হাজার টাকা দিলেই রাতের বেলা পেরিয়ে যেতে পারবেন। ওই বিএসএফকে এপারে কিছু দিতে হয়। ওরা আমাকে চেনে,

জানে। অসুবিধা হবে না।' পুলিশের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় জানান দিল, 'ঠিক জায়গায় বলটা পড়েছে। ওরা লুকিয়ে থাকা অতিথির প্রসঙ্গটি আড়াল করতে এই বিষয়টি পছন্দ করছে।' সে করুক। নিজের কাজটি প্রায় সফল হয়েছে, এই আত্মবিশ্বাস নিয়ে চারিদিক একবার ঘাড় ঘুরিয়ে ভালো ভাবে মেপে নিয়ে, অরিন্দম বেরিয়ে এল ওই বাড়ি থেকে। তার পিছন পিছন সেই রশিদ। যার বাড়িতে দুপুরে খাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পরবর্তী দু'ঘণ্টায় অবশ্য টুকটাক কিছু বিষয় ছাড়া সেভাবে বিস্তারিত কিছু কথা হল না। তবে তাতেও বেশ বোঝা গেল পাশাপাশি বাড়ির মধ্যে সম্পর্ক খুব ভালো নয়। সুযোগ পেলেই দু'পক্ষ পরস্পরকে খোঁচা দিতে ছাড়ছে না। একজন পুলিশের কাছে এর চেয়ে অনুকূল পরিবেশ আর কি হতে পারে? এই ভাবনা ভাবতে ভাবতে খাওয়া দাওয়া করে চেপে বসল কলকাতাগামী ট্রেনে। সঙ্গে করে নিয়ে এল চায়ের দোকানে পরিচিত হওয়া রশিদের ফোন নম্বর। যিনি, তাঁকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অতিথির মতো আদর যত্ন করে খাইয়েছিলেন।

কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তর লালবাজার। বসের ঘরে যেতেই তিনি একটি রিপোর্ট জমা দিতে বললেন। ফলে, সারাদিন কেটে গেল তা তৈরি করতেই। সন্ধ্যাবেলা ছ'পাতার সেই রিপোর্ট বস, রাকেশ কুমারের হাতে তুলে দেওয়ার পর খানিকটা টেনশনও শুরু হল। যদি শেষ পর্যন্ত বসের পছন্দ না হয়, তাহলে কী হবে? সেই উচাটন অবশ্য খুব একটা দীর্ঘস্থায়ী হল না। চল্লিশ মিনিটের মধ্যে ফোন এল দ্বিতীয় তলার ওই ঘরে যাওয়ার জন্য। মেরুন রঙের মোটা পর্দাটা সরিয়ে ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে প্রায় পড়েই যাচ্ছিল সে। কোনওক্রমে সোজা হয়ে ভিতরে ঢুকে মুখটা বাড়াতেই বস ডেকে নিলেন। নির্দেশ দিলেন, সামনের চেয়ারে বসে পড়তে। অরিন্দমের মনে হল, সম্ভবত তাঁর কাজটা খুব খারাপ হয়নি। না হলে একটা হালকা আভাস অন্তত পাওয়া যেত। বস তখন শেষ পাতাটা মন দিয়ে পড়ছিলেন। যেখানে লেখা ছিল—দেরি না করে আজকালের মধ্যেই রেইড করলে সুবিধা হতে পারে। কারণ, আমার মনে হয়েছে যাঁকে আমরা খুঁজছি, তিনি আমার চিহ্নিত করা বাড়িতেই রয়েছেন।

মুচকি হাসি ভেসে উঠতে দেখা গেল রাকেশের মুখে। একটা অদ্ভুত টানে বাংলা বলা তাঁর অভ্যাস। রিপোর্টটা টেবিলের ওপর একপাশে রেখে এবার তিনি মুখ খুললেন। 'ইটস ইয়োর বেবি। তুমি যদি মনে করো আজ রাতেই রেইড করতে পারো। ব্যাকআপ ফোর্সের ব্যবস্থা হয়ে যাবে। বাট, তুমি কি কনফিডেন্ট?'

—'ইয়েস স্যার। হান্ড্রেড পার্সেন্ট।' বেশ জোরের সঙ্গেই বলল অরিন্দম।

'গো অ্যাহেড' গমগমে গলায় যেন নির্দেশ দিলেন রাকেশ। ওই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে তার সঙ্গে কারা যাবে, তাদের খোঁজ করা শুরু করল।

কলকাতা পুলিশের এসটিএফ ততদিনে বেশ প্রতিষ্ঠিত। বিশেষ করে জঙ্গি দমনে। ফলে সম্মতি মিলতেই হইহই করে শুরু হল অভিযান চালানোর প্রস্তুতি। মাঝে আধঘণ্টার জন্য আলোচনা করতে ডাকলেন বস। তিনি ঠিক করে দিলেন, কীভাবে করতে হবে, আসল অপারেশন।

সন্ধ্যা ছ'টা। লালবাজার থেকে দু'টো টাটাসুমো নিয়ে রওনা দিল এসটিএফের দুটি আলাদা দল। একটি দল মূল অপারেশন করবে। অন্যদল তাদের সহায়তায় থাকবে। যাওয়ার আগে নিছক গল্প করার কায়দায় বসিরহাটের চায়ের দোকানে পরিচিত হওয়া সেই রশিদকে একবার ফোন করে নিল অরিন্দম। একথা-সেকথা বলার মাঝেই জানতে চাইল, পাশের বাড়ির মেহমান আছে কি না। ওপার থেকে যা শোনা গেল, তা বেশ স্বস্তিদায়ক। যার খোঁজে যাওয়া হচ্ছে তিনি নাকি বহাল তবিয়তে রয়েছেন সেখানে। তবু ঝুঁকি নেওয়া যায় না। জঙ্গি সংগঠনগুলি তাদের সদস্যদের খুব বেশি সময় ধরে এক জায়গায় রাখে না। ঘন ঘন শিবির পরিবর্তন করায়। অথচ একে প্রায় চার দিন রেখে দেওয়া হয়েছে একই বাড়িতে। বিষয়টা খানিক অদ্ভুত হলেও সেটাই বাস্তব।

বসিরহাটে পৌছতে বেশিক্ষণ সময় লাগল না। তবে মূল শহরে ঢোকার মুখে, রাস্তার ধারে একটি হোটেলে খাবার খেতে ঢুকে পড়ল তারা। অরিন্দমরা জানত, প্রতিটি এলাকায় রাজ্য পুলিশ নিজেদের মতো করে নজরদারি করে। বিশেষ করে সেই সব এলাকায়, যেখানে দল বেধে সাধারণ মানুষ বেড়াতে যান। দু'টো টাটা সুমো চেপে এক ঝাঁক যুবক ওই এলাকায় ঢুকেছে, এটা জানতে স্থানীয় পুলিশের খুব একটা সময় লাগার কথা নয়।

নিজের এলাকায় এ ধরনের প্রায় প্রতিটি হোটেলে স্থানীয় পুলিশের নিজস্ব সোর্স থাকে। ফলে তারা কলকাতা থেকে ভাড়াটে খেলোয়াড় হিসেবে স্থানীয় একটি টুর্নামেন্টে খেলতে এসেছে, এরকম একটা কথাবার্তা নিজেরাই খাওয়ার ফাঁকে কায়দা করে ছড়িয়ে দিল। গুণে দেখা গেল, ঠিকই তো, প্রায় একটা ফুটবল টিমের মতো এগারো জনই রয়েছে তাদের দলে। কাজ শুরুর আগে থেকেই সিদ্ধান্ত নেওয়া ছিল, খুব সাবধানে অপারেশনটা চালাতে পারলে সমস্যা হবে না। যাকে ধরতে যাওয়া হচ্ছে, সে যেহেতু বাইরে খুব একটা বেরোচ্ছে না, ফলে বিভিন্ন দিক থেকে ঠিক ভাবে ঘিরে ধরতে পারলে অভিযুক্তের পক্ষে পালানোটা কঠিন হবে।

রাত বারোটা নাগাদ দু'টি টাটাসুমো পৌছে গেল ওই বাড়ির কাছাকাছি। গ্রামের দিকে অত রাত মানে, কয়েক বছর আগেও ছিল সারা বাড়ি অন্ধকার করে ঘুমিয়ে পড়া। আধুনিকতার চাপে পরিস্থিতি অনেকটা পাল্টেছে। গ্রামের বাসিন্দারা এখন রাত পর্যন্ত টিভিতে সিনেমা, সিরিয়াল, খেলা দেখেন। অনেকেই, পরের দিন দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। শহুরে মানসিকতা তাদের মধ্যে প্রবল ভাবে ঢুকে গিয়েছে। ফলে হুড়মুড় করে ঢুকে পড়লে সতর্ক হয়ে যেতে পারেন সবাই। অথবা, চেঁচিয়ে এলাকার লোকদের জাগিয়ে তুলতে পারেন। প্ল্যান অনুযায়ী, গাড়ির সব আলো নিভিয়ে খানিকটা দূরে অন্ধকারে মাঠের মধ্যে দাঁড় করিয়ে রাখা হল। অরিন্দম নিজে গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে গেল বাড়ির কাছাকাছি। এই বাড়ির অন্দরমহল সম্পর্কে পুরো টিমে বেশ খানিকটা ধারণা রয়েছে একমাত্র তারই।

সামনে গিয়ে আন্দাজ করা গেল, সম্ভবত সবাই ঘুমিয়ে পড়েছেন। তবে বাড়ির টিনের গেটটা ভেতর থেকে বন্ধ করা। তাতে সমস্যা নেই, লাগোয়া পাঁচিলটা এতটাই ছোট যে, একটুখানি লাফিয়ে ঢুকে পড়া কোনও ব্যাপার নয়। দু'দিন আগে ঘুরে যাওয়ায় তার বেশ মনে পড়ল, এটা টপকে ঘরগুলোতে ঢুকতে গেলে আরও একটা দরজা পেরোতে হবে। সুবিধা একটাই, আর তা হল, যে

ঘরে তাদের 'অতিথি' রয়েছে সেটা মূল বাড়ির একটা অংশে। ফলে একবার ভিতরে ঢুকে গেলে, ওই ঘরের কাছে চলে যেতে কোনও অসুবিধা হওয়ার কথা নয়।

অযথা ঝুঁকি নেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই, মনে মনে ভেবে নিল সে। বস লালবাজারে বসে পুরো প্ল্যানটা তৈরি করে দিয়েছেন বটে, তবে সেটা যে প্রয়োজনে পরিবর্তন করতে হতে পারে এই নির্দেশও দিয়ে রেখেছেন এরই পাশাপাশি। ফলে দলের সবচেয়ে দায়িত্বপ্রাপ্ত সদস্য হিসেবে তাকেই ঠিক করতে হবে ক'পা এগনো যাবে, অথবা দরকার পড়লে পিছিয়ে আসতে হবে ঠিক কতটা। মাহেন্দ্রক্ষণ হিসেবে ধরা হল, রাত পৌনে একটা। হাতে তখনও কুড়ি মিনিটের মতো সময় রয়েছে। তা তো হল, কিন্তু এই সময়টুকুও যে গাড়িতে বসে কাটানো যাবে এমন গ্যারান্টি কোথায়? কয়েকবার ওঠানামা করতে গিয়ে গাড়ির ভিতর যেভাবে মশার দল ঢুকে পড়ে পাল্টা আক্রমণ শুরু করেছে, তাতে অবস্থা রীতিমতো শোচনীয়। অন্ধকারে নিজেরাই ঠাসাঠাসি করে গাড়িতে এমন ভাবে বসে রয়েছে যে, মশা মারবে সে জায়গাটুকু পর্যন্ত নেই। তবে খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না। সময়টা কেটে গেল বেশ দ্রুত।

পুলিশ অফিসারদের হাতে যতই পিস্তল থাকুক না কেন, তাদের মধ্যে বেশির ভাগই ভীষণ রকমের কুসংস্কারে বিশ্বাসী। নামার আগে সামনে রাখা ঠাকুরের ছবিতে প্রণাম করে তবেই একের পর এক নামলেন গাড়ি থেকে। তারপর দু'টি দলে ভাগ হয়ে রাতের অন্ধকারে এগিয়ে চললেন সেই বাড়ির দিকে। অরিন্দম লক্ষ করল, এবার তারও একটু একটু করে টেনশন শুরু হয়েছে। শেষ মুহূর্তে মনে হল, যদি তার আনা খবর না মেলে তাহলে কী হবে?

কোনও ভালো কাজ করার আগে এ ধরনের ভাবনা মনকে দুর্বল করে দেয়। ফোকাস ঠিক রাখতে নিজের স্নায়ুকে কঠিন এবং শক্তিশালী রাখা এসময় আসল কাজ। একজন কর্তব্যপরায়ণ পুলিশ কর্মী হিসেবে সে তাই করল। ইশারায় দলের অন্যদের তাকে ফলো করতে নির্দেশ দিল। তারপর দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল চিহ্নিত বাড়ির দিকে। স্কেচ করে অঙ্কের ফর্মুলার মতো সাজানো ছিল পুরো বিষয়টি। সেই অনুযায়ী প্রত্যেকে তাদের পজিশন নিয়ে নিল। অযথা দরজা ভেঙে আওয়াজ করে ভিতরে না ঢুকে, পাশের পাঁচিল টপকে প্রথমে ঢুকে গেল সে নিজে। আসলে, অনেক বাড়িতে কুকুর থাকে। ফলে অচেনা কাউকে এভাবে ঢুকতে দেখলে কুকুর চেঁচাতে থাকে। এ বাড়ির ক্ষেত্রে অবশ্য সেরকম কিছু হল না। হাত বাড়িয়ে দ্বিতীয় জনকে, তারপর তৃতীয়জনকে এভাবে ছ'জনকে তুলে নেওয়া হল ভিতরে। বাইরের পাঁচিলে গা ঘেষে অপেক্ষা করা শুরু করল ব্যাকআপ টিম। আগে ঘুরে যাওয়ায় অন্দরমহলটা জানা ছিল অরিন্দমের। পরের দরজাটা একটা সামান্য ছিটকিনি দিয়ে আটকানো ছিল। সেটা খুলে পা টিপে টিপে গোটা টিমটাকে সঙ্গে নিয়ে, কোনও রকম বাধা ছাড়াই পৌছে গেল সেই ঘরের সামনে।

তারপর, এক মুহূর্ত থমকে গেল। কারণ, এবারই নিতে হবে সেই চরম সিদ্ধান্ত। সরাসরি দরজা ভেঙে ভিতরে ঢুকে যাবে, নাকি দরজা নক করে তা খুলতে বাধ্য করবে অতিথিকে? দ্বিতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়াটা একটু বিপজ্জনক ছিল। এত রাতে দরজা নক করলে হঠাৎ করে হামলা চালাতে পারে

ভিতরে থাকা ব্যক্তি। যেমনটা তার কিছু দিন আগে ঘটেছিল বাংলাদেশে। সেখানকার পুলিশ এক জঙ্গির ডেরায় হানা দিলে বাচ্চা কোলে নিয়ে তার স্ত্রী জানলা খোলেন, তারপর গ্রেনেড ছুড়ে দেন পুলিশের দিকে। শেষে পুলিশ বাহিনীকে বিভ্রান্ত করে পালিয়ে যান পিছনের দরজা দিয়ে।

জঙ্গিদের এই কৌশলটা জানা ছিল অরিন্দমের। কাজেই ঘরের চারপাশে একবার পাক দিয়ে দেখে নিল,সেই সম্ভবনা রয়েছে কি না। নিশ্চিত হওয়ার পর হাত নেড়ে ডেকে নিল আরেকজনকে। তাকে গার্ড করে অন্ধকারের মধ্যে তখন আরও প্রায় তিন-চারজন একটু আড়াআড়ি দাঁড়িয়ে, যাতে আচমকা হানা হলে তেমন কোনও ক্ষতি না হয়, অথচ পাল্টা আঘাত করা যায়। এমনিতেই অরিন্দমের চেহারা একটু ভারিক্কি হওয়ায় সেটার একটা বাড়তি সুবিধা সে পায়। এবারেও সেটার ফায়দা তুলতে দরজায় দু'টো লাথি মারতেই দেখা গেল অত্যন্ত পলকা ভাবে দরজার খিল লাগানো ছিল। শেষ মুহূর্তে মনে হল, হাত দিয়ে ঠেললেই হয়ত খুলে যেত।

যাই হোক, ভিতরে যখন ঢোকাই গিয়েছে, তখন অত ভাবার সময় নেই। অন্ধকারেই খানিকটা আন্দাজে ঘরের দুই কোণে চলে গেল দু'জন, পজিশন নিয়ে। ঘরের ভেতর শুয়ে থাকা ব্যক্তি ততক্ষণে হুড়মুড়িয়ে জেগে উঠেছেন। বসে পড়েছেন বিছানার ওপর। তিনি কিছু বুঝে ওঠার আগেই ঝাঁপিয়ে পড়ল অরিন্দম। লম্বা হাত বাড়িয়ে গলাটা পেঁচিয়ে ধরল সাপের মতো। তার সঙ্গী যে অফিসার, তিনি শুধু ওই ব্যক্তির মুখে প্লাস্টিকের একটা প্যাকেট পরিয়ে দিলেন। ততক্ষণে যা আওয়াজ হয়েছে, তাতে বাইরে বেরিয়ে এসেছেন বাড়ির অন্য সদস্যরা। এদিকে, ব্যাকআপ ফোর্সও ঢুকে পড়েছে বাড়ির ভিতরে। তারা হিসহিসে গলায় শুধু বলল, 'কোনও আওয়াজ করবেন না। আমরা পুলিশ। চিৎকার করলেই গুলি চালিয়ে দেব। কাল সকালে থানায় যোগাযোগ করবেন। এখন আমাদের যেতে দিন।'

কিছু বলার মতো সাহস এবাড়ির কেউ দেখাতে পারল না। বিনা বাধায় ঘরের ভিতর থেকে একজনকে তুলে বেরিয়ে এল তারা। অপারেশনটা সাকসেসফুল করার পর বাড়ির বাইরে এসে, নিজেকে হালকা করতে, গলা ছেড়ে যেন চেঁচাতে ইচ্ছে করছিল। সেটা তখন আর সম্ভব নয়। তাদের নতুন অতিথিকে নিয়ে দ্রুত রওনা হতে হবে কলকাতার দিকে। ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুক চিড়ে দু'টি গাড়ি রওনা দিল এলাকা ছেড়ে। গোটা গ্রাম তখন ঘুমিয়ে।

কাজ শেষ করেই বসকে ফোনে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল পুরোটা। তিনি প্রায় সারারাত জেগে বসেছিলেন বাড়িতে। ফেরার পথে ফোন এল তাঁর। ওপার থেকে নির্দেশ পেতেই, গাড়িতে ধৃতের সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন এসটিএফের গোয়েন্দারা। এবং তা বসের ফোন অন রেখে। যাতে তিনি শুনতে পান, সন্দেহভাজন ঠিক কী বলছে। গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্লাস্টিকের প্যাকেটটা খুলে নেওয়া হয়েছিল যাতে দমবন্ধ না হয়ে আসে। খড়খড়ে গলায় অরিন্দম কথা বলা শুরু করল, 'আনসার, তাহলে এখানে এসেছিলি কেন? হামিদ কি যোগাযোগ করেছিল?' আনসার যেন আরও বেশি ধূর্ত। অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'স্যার, আপনারা বোধহয় ভুল করছেন। আমি আনসার নই। আমার নাম রফিউল ইসলাম। রাজশাহিতে বাড়ি। পাসপোর্ট আছে। এখানে ব্যবসার কাজে

এসেছি।' শিকারকে এত ঠান্ডা গলায় উত্তর দিতে দেখে মাথায় রক্ত চড়ে গেল অরিন্দমের। চলন্ত গাড়িতেই তাকে সপাটে একটা চড় লাগালো । বিরাশি সিক্কার সেই চড়ে প্রায় টাল খেয়ে পড়ে যাচ্ছিল আনসার। কোনও ক্রমে নিজেকে স্বাভাবিক করে আবারও বলল, 'আমি ফোন নম্বর দিচ্ছি, না মেরে যোগাযোগ করুন ওপারে। জানতে পারবেন আমি কে।'

এবার যেন একটু থতমত খেয়ে গেল এতক্ষণ ধরে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস দেখানো অরিন্দম। তাহলে কি ভুলই করে ফেলল সে? বাড়তি ঝুঁকি নিয়ে ফেলা হল? হঠাৎ মনে হল, ফোন অন করা রয়েছে। বস তো সবই শুনতে পাচ্ছেন, ওপার থেকে। সব কেমন তালগোল পাকিয়ে যেতেই সে ফোনটা কানে নিয়ে রাকেশের কাছে জানতে চাইল, 'স্যার, কী করব এবার?' চরম উত্তেজনার সময় যুগ্ম কমিশনারের মাথা বরফের মতো ঠান্ডা হয়ে যায়। এটা তাঁর পরিচিত স্বভাব। ফলে বসের নির্দেশ এল, 'কিছু করতে হবে না। আর্মসটা ওর মাথার সামনে ধরে বলো, সত্যি কথা বলবি, নাকি মাথায় গুলি চালিয়ে বডিটা রাস্তার ধারে ফেলে দিয়ে যাব?' কান থেকে ফোনটা সরিয়েই অরিন্দম দ্রুততার সঙ্গে তাই করল।

কপালে পিস্তলটা ঠেকিয়ে প্রায় হুমকির সুরে বলল, 'শোন শালা, যদি এবার ঠিকঠাক না বলিস তাহলে গুলিতে এফোঁড়ওফোঁড় করে দেব। এক মিনিট টাইম দিচ্ছি, ঠিক করে নে কোনটা করবি?' কাজ দিল এই টোটকায়। খানিকটা কেঁপে উঠল ধৃত ব্যক্তি। মুখটাও কেমন যেন চেঞ্জ হয়ে গেল। চোখ বন্ধ করে আতঙ্কটা কাটাতে চাইলো সে-ও। নিজের ডান হাতটা দিয়ে তার মাথার পিছন দিকে জোরে একটা চাটার মতো দিল অরিন্দম। চোখটা খুলল। তারপর মিনমিন করে বলতে শুরু করল, 'কী জানতে চান বলুন?' প্রায় বাঘের মতো চারজন যেন ঘাড়ে লাফিয়ে ওঠল তার। 'বল, কেন এপারে এসেছিস? কার সঙ্গে দেখা করতে চাস? কী কাজ করতে পাঠানো হয়েছে তোকে?' ঝড়ের গতিতে একসঙ্গে সব প্রশ্ন যেন জোর করে চাপিয়ে দেওয়া হল অভিযুক্তর উপর। চোখটা পিটপিট করতে করতে অভিযুক্ত বলল, 'আমার নাম রফিউল, বাড়ি রাজশাহী। ব্যবসার টাকা পেমেন্ট করতে এখানে এসেছি।' আর তর সইলো না টিমের মধ্যে সবচেয়ে কম বয়সী রাজার। রাগের চোটে চলন্ত গাড়ির দরজা খুলে প্রায় নিজের দিকে অভিযুক্তকে টেনে নিয়ে বলল,'শালা, শু……………। একদম ফেলে দেব গাড়ি থেকে। তারপর কুকুরের মতো মরবি। বাড়ির লোকেরা বডি নিতেও আসবে না।'

কিন্তু না, কোনও ধমকেই কাজ হলো না। কিছুতেই বাড়তি কিছু বলানো গেল না অভিযুক্তকে। ভেতর-ভেতর ফুঁসছিলেন প্রত্যেক অফিসার। এত কষ্ট কি তাহলে বৃথাই যাবে? কারও খেয়ালই ছিল না বসের ফোন অন করা রয়েছে। তিনিও সম্ভবত বুঝতে পারছেন এদের দুঃখ-কষ্ট। এবার হুঁশ ফিরল। অরিন্দম আবার ফোনটা কানের সামনে এনে বলে উঠল,'স্যার, প্রচণ্ড কনফিউজড মনে হচ্ছে নিজেকে। কী করব বুঝে উঠতে পারছি না।' আবারও ঠান্ডা গলায় বসের জবাব, 'কোনও টেনশন করতে হবে না। কুল বয়েজ। সোজা গাড়ি নিয়ে লালবাজারে চলে এস। ওখানে আমি ওয়েট করছি।'এবার সমস্বরে চালককে নির্দেশ দেওয়া হল যত জোরে সম্ভব গাড়ি চালিয়ে লালবাজারে ঢুকতে। যেন এই নির্দেশ পাওয়ার অপেক্ষায় ছিল চালক বিশু। গাড়ি প্রায় উড়িয়ে নিয়ে সে ঢুকিয়ে

দিল লালবাজারের ভিতর। রাতের অন্ধকার কেটে ততক্ষণে নতুন একটা সকাল শুরু হয়েছে কলকাতায়।

গাড়ি থেকে টেনে নামানো হল সন্দেহভাজন আনসারকে। প্রায় ছেঁচড়ে তাকে নিয়ে যাওয়া হল এসটিএফের দপ্তরে। নিজের ঘরে ঢোকার আগে বস বললেন, 'ওয়েল ডান বয়েজ।' তারপর চারজনকে ডেকে নিলেন । সেই দলে অরিন্দমও। বিধ্বস্ত হয়ে ভিতরে বসে পড়ল পুরো টিম। আগেই বলা হয়েছে, কঠিন পরিস্থিতি বসকে হিমশীতল করে দেয়। সবাই তার থেকেই আন্দাজ করতে পারে এ যেন ঝড়ের আগে মৃদুদখিণা বাতাস। সন্দেহভাজনকে বসানো ছিল মাটিতে। রাকেশ চেয়ারে গিয়ে বসলেন। তারপর নিজের টেবিলে ডানদিকের ড্রয়ার খুলে একটা ফাইল তুলে আনলেন। টেবিলের ওপর সেটা খুললেন একদম ধীরগতিতে। যেন কিছুই হয়নি এমন ভাবে। ভিতর থেকে বার করলেন একটা ছবি। সেই ছবিটায় একবার চোখ বুলিয়ে তা নিয়ে ধরলেন সন্দেহভাজনের একদম চোখের সামনে। অরিন্দম পুরোটাই নজরে রাখছিল। পরিষ্কার দেখতে পেল, ছবিটার দিকে একবার তাকিয়েই মুখটা কেমন বদলে গেল অভিযুক্তের। রক্তশূন্য হওয়ার মতো ফ্যাকাশে হয়ে গেল একসময়।

বসের নির্দেশ এল, 'একে একটু চা-জল দাও। আর সকাল হয়ে গিয়েছে, কাজেই তোমরা বাড়ি চলে যাও। বেলা বাড়লে পুরোটা দেখা যাবে।' অরিন্দমের কাছে বিষয়টা কেমন অবিশ্বাস্য লাগছিল। তারা অত হম্বিতম্বি করছিল। অথচ বস তো একটা টোকাও মারল না। কিন্তু কী এমন করল যে, মুখ থেকে কোনও শব্দ বার করার আগেই আত্মসমর্পণ করে বসল অভিযুক্ত। মনে মনে বলল, 'এই না হলে বস, ঘরে ডেকে এনে কেমন মুরগি বানাল সবাইকে।' তবে ধরে আনা ওই সন্দেহভাজনের ওপর সবচেয়ে বেশি রাগ বোধহয় হচ্ছিল ওরই। গাড়িতে তোলার সময় বিরাট তড়পাচ্ছিল। এখন দেখো, কেমন ভিজে বেড়াল হয়ে গিয়েছে। সব কিছু ছাপিয়ে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব অবশ্যই হচ্ছিল। সে যাকে চিহ্নিত করে এসেছিল, সেই কাজটা তাহলে পারফেক্ট ছিল।

পর দিন দুপুর বারোটা। ততক্ষণে সিদ্ধান্ত হয়ে গিয়েছে ধৃতকে আজই আদালতে পেশ করে নিজেদের রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আবেদন জানাবে এসটিএফ। তার আগে আরও একটা কাজ বাকি, আর তা হলো কেস ডায়েরি লেখা। যাদের গ্রেপ্তার করে আদালতে পাঠায় পুলিশ, তাকে কেন ধরা হয়েছে সেই যুক্তি লিখিত আকারে আদালতে পেশ করতে হয়। সেটাই কেস ডায়েরি। তো অরিন্দম ঘরে ঢুকতেই বসের আদেশ, 'অরিন্দম, চলে এস। আমি বলছি, তুমি কেস ডায়েরিটা লিখে নাও। এক সপ্তাহের জন্য রিমান্ডে নেব আমরা। তারপর প্রয়োজন পড়লে বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। প্রেসের লোকেরা এখনও জানে না। খবর পেয়ে রিপোর্টাররা কোর্টে গেলে অ্যাকিউজডের মুখটা ঢেকে দিও।' পুরোটা শুনে নিয়ে ডিকটেশন নিতে বসল সে। লিখতে গিয়ে বুঝল কেন সবার চেয়ে, সব কিছুতেই বস এতটা এগিয়ে। নামেই সে বসিরহাট গিয়ে কাজ করে এসেছে, আসল কাজটা এই ঠান্ডাঘরে বসে করে দিয়েছেন একজন, তিনি রাকেশ কুমার। ধৃতের নাম যে আনসার, শুরুতেই সেটা স্পষ্ট করে লেখার জন্য বলে দিলেন তিনি। কবে, কখন, কাকে ধরে বাংলাদেশ থেকে এপারে সে এসেছে, সবই গরগর করে বলে দিলেন বস। তাঁর মুখ থেকেই অরিন্দম জানতে পারল লস্কর-ই-তইবা সংগঠনের

কতটা গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিল ধৃত আনসার। একটা সময় লেখাটা থামাতে হল। কারণ, বস নিজেই থামাতে বললেন। কিন্তু একটা প্রশ্ন ভেতর থেকে বারবার খোঁচা দিয়ে যাচ্ছিল তাকে। যার উত্তর কেমন করে পাওয়া যাবে, সেটাই ভেবে চলেছিল। একটা সময় আর থাকতে না পেরে ভয়ে ভয়ে প্রশ্নটা করেই ফেলল, 'স্যার, একটা কথা বলব।' রাকেশ মুখ নিচু করে কিছু একটা দেখার কাজে মন দিয়েছিলেন। চশমাটা খুলে তিনি বললেন, 'যেটা জানতে চাইছো, সেটা ট্রায়ালের সময় জানতে পারবে। আপাতত এই কাজটা করো।' আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। এরকম বস থাকলে সেই বিভাগ যে সবার থেকে এগিয়ে থাকবে, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। আদালতে যাওয়ার প্রস্তুতি নিল সে। তবে এসটিএফের কেস ডায়েরি অনুযায়ী রেকর্ড থাকল, কলকাতার তিলজলা থেকে ধরা হয়েছে আনসারকে।

আদালতে গিয়ে দেখা গেল, যার বাড়ি থেকে আনসারকে ধরে আনা হয়েছিল সেই ভদ্রলোক হাজির হয়েছেন। এমনকী একজন আইনজীবীও রাখা হয়েছে। ফলে এদের মধ্যে যে ভালো যোগাযোগ ছিল তা অনেকটাই পরিষ্কার হল। ধৃতের আইনজীবী জামিনের জন্য জোরালো সওয়াল করলেন বটে, তবু সন্তুষ্ট করা গেল না বিচারককে। দিনের শেষে জানানো হল, পাঁচ দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আনসারের। বাইরে বেরতেই ছেঁকে ধরলেন চ্যানেলের সাংবাদিকরা। এদের মধ্যে অনেকেই তার পরিচিত। চেনা লোক পেয়ে তাদেরও হাজার প্রশ্ন শুরু হলো। মনে মনে হাসি পাচ্ছিল। একটা সময় কত খবরের জন্য তাকেও এভাবে ছুটে আসতে হত। নানা রকম প্রশ্ন করত। বেশির ভাগ দিনই এমন হয়েছে যে, পরিচিত অফিসার একটা মুচকি হাসি দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতেন, তার সব প্রশ্নের জবাব না দিয়েই। নিজের অভিজ্ঞতা থেকে সেই কৌশলটাই এবার কাজে লাগানোর চেষ্টা করল সে। সবার প্রশ্ন মন দিয়ে শুনতে শুরু করল। অরিন্দম জানত, একটা প্রশ্নের উত্তর না পেলে অধৈর্য হয়ে রিপোর্টাররা আরও প্রশ্ন করা শুরু করবে। এবার তাকে থামাতে গিয়ে অন্যরা তাদের প্রশ্ন করবে। ফলে সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যে চেঁচামেচি শুরু হয়ে গেলে আসল ব্যাপারটা কেঁচে যাবে। মিলেও গেল অনুমানটা। মিনিট দু'য়েক প্রশ্নের ঝড় সামাল দিতেই সাংবাদিকদের নিজেদের মধ্যেই ঝামেলা শুরু হয়ে গেল। সেই সুযোগে কেটে পড়ার অফুরন্ত সময় পাওয়া গেল। প্রায় দৌড়ে গিয়ে এবার উঠে পড়ল নিজেদের গাড়িতে। লালবাজারে পৌছে বসের কাছে ব্রিফ করল পুরো বিষয়টা। ধৃতকে জেরা করার জন্য পাঁচ দিনই যে যথেষ্ট, তা বোঝা গেল বসের চোখমুখ দেখে।

ফের দু'দিন বাদেই সাতসকালে ফের ডেকে পাঠালেন বস। হাতে একটা চিরকুট ধরিয়ে নির্দেশ দিলেন, একে তুলে আনতে হবে। আজ রাতে তুলতে পারলে ভালো। নাহলে বেরিয়ে যেতে পারে। চিরকুটে একবার চোখ বুলিয়ে অরিন্দম দেখতে পেল, তাতে যে ঠিকানাটা দেওয়া রয়েছে, তা কলকাতার তিলজলা এলাকার। বুঝতে অসুবিধে হল না, এবারের অ্যাসাইনমেন্টটা অনেক বেশি টাফ। আর যাই হোক, বসিরহাটের গ্রাম্য সরলতা তিলজলাতে একবিন্দুও পাওয়া যাবে না। সেখানে পদে পদে বাধা পাওয়ার সম্ভবনা। ফলে আগের তুলনায় অনেক বেশি সতর্ক হয়ে যেতে হবে। বসের

নির্দেশ, তাই এবারের কাজটাও নিখুঁত ভাবে করতে হবে। শুধু আগের বারের থেকে একটা পার্থক্য দেখা গেল তিলজলার ক্ষেত্রে। বসিরহাটের মিশনে বস পইপই করে বলে দিয়েছিলেন কী করতে হবে, আর কী করা চলবে না। এবারে তার কিছুই হল না। বস যেন ধরেই নিয়েছেন, কাজটা সে পারবে। অর্থাৎ একদিক থেকে দেখতে গেলে একটা বিশ্বাসযোগ্যতা বা ভরসার জায়গা অর্জন করতে পেরেছে কলকাতা পুলিশের অপেক্ষাকৃত নতুন এই সার্জেন্ট। নিজের মনেই এসব ভাবতে ভাবতে বসের ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের দপ্তরে ঢুকল সে।

এবার রাতের টিমটা কখন বেরোবে তা একবার দেখে নেওয়ার ইচ্ছে হল। প্রতিটি অপারেশনেই যদি চেনা জানা সঙ্গী সঙ্গে থাকে, তাহলে বাড়তি সুবিধা পাওয়া যায়। এসব ক্ষেত্রে নিজেদের মধ্যে আগে থেকে একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং থাকাও প্রয়োজন। ভিতরে ঢুকে অবশ্য বুঝল, বেশ একটা রিলাক্স মুডে রয়েছে সবাই। এক ঠোঙা গরম চপ আনা হয়েছে। চা তো রয়েছেই। এই সময়ে পরিবেশটা অযথা গম্ভীর করে দেওয়ার ইচ্ছে হল না তার। সুতরাং নিজেও যোগ দিল সান্ধ্য চায়ের আসরে। গল্পে গল্পে জমে উঠল আড্ডা। কেটেও গেল অনেকটা সময়।

প্রায় ঘণ্টা দেড়েক এভাবে কাটার পর এবার তুলল প্রসঙ্গটা। জানতে চাইল, কে কে থাকছে আজকের অ্যাসাইনমেন্টে? তাকে অবাক করেই ওসি (এসটিএফ) বিশ্বাসবাবু জানালেন, 'স্যার বলেছেন, কাজে যাওয়ার আগে জানাবেন, কে থাকবে ওই টিমে। ফলে সকলেই অপেক্ষা করছে।' অরিন্দমের মনে হল, বস সম্ভবত আজ কোনও মাস্টার স্ট্রোক দিতে চান। তাই পুরো বিষয়টি ইচ্ছে করেই ঝুলিয়ে রেখেছেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে খুব একটা আলোচনা আর হল না, শুরু হল দ্বিতীয় দফার কথোপকথন।

আচমকা ফোন এল ওসি (এসটিএফ)-এর কাছে। তিনি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছুটে গেলেন। ছোটার ধরণ দেখেই মালুম হল, ফোনটা বস ছাড়া আর কারও হতে পারে না। মিনিট পাঁচেক কাটলো। ওসি ফের রুদ্ধশ্বাসে ঘরে এসে ঢুকলেন। তারপর ডেকে পাঠালেন তাকে। এবং প্রায় ফিসফিস করে কানের কাছে নিজের মুখটা আনলেন, 'শোনো, স্যার বলেছেন, এবারের রেইডে শুধু তুমি আর দু'জন যাবে। ব্যাকআপ ফোর্সে থাকবে তিনজন। সময় অল্প, তবু তারমধ্যে একটা হোমওয়ার্ক করে নাও।' প্রথমবার শুনে অরিন্দমের মনে হল, বস কি তার কাজে সন্তুষ্ট হচ্ছেন না? নাহলে, প্রতিক্ষেত্রে শেষ মুহূর্তে তাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেওয়া হচ্ছে কেন? ভেতর থেকে একটা অদৃশ্য হতাশা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে চাইছিল যেন।

না, ভাবনাটা ভুল হল। নিজেই নিজেকে বলে হতাশাটা ঝেড়ে ফেলল মন থেকে। কাজের আগে এসব চিন্তা করার কোনও মানেই হয় না। হয়ত বস রোজ নতুন করে লড়াইয়ের মুখে ফেলে তাকে আরও তীক্ষ্ণ করে তুলতে চাইছেন। আগামীতে যা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তাকে। মিনিট দশেকের মধ্যে রেডি হয়ে নিল অরিন্দম। একটা ফাঁকা ঘরে ঢুকে পড়ল কাগজ-কলম নিয়ে। নিজের মনেই তাতে আঁকিবুকি করে একটা খসড়া তৈরি করে ফেলল। তারপর আর অপেক্ষা না করে সেটা নিয়ে সরাসরি ঢুকেও পড়ল ওসির ঘরে। একবার দেখিয়ে নিল সেটা। কোনও আপত্তি অবশ্য তিনি

করলেন না। শুধু আওড়ালেন বসের সেই বাধাবুলি, ‘ইটস, ইয়োর বেবি।’ শুনে একবার মুচকি হাসি দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে এল সে। পুরো ডিপার্টমেন্ট জুড়ে এসি চললেও গরম লাগছিল অরিন্দমের। বুঝতে পারল ১০০ মিটার দৌড়ের জন্য শরীর প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করেছে।

খানিকক্ষণ পর মোবাইলে পর পর ফোন এল দু’জনের। তারা জানতে চাইলেন, ঠিক কখন লালবাজার থেকে রওনা দেওয়া হবে। অরিন্দম এসব ক্ষেত্রে ভীষণ সন্দেহবাতিক। কোনও রকম ঝুঁকি নিতে সে রাজি নয়। উল্টোদিকে থাকা নিজের সহকর্মীকে জানিয়ে দিল, আজ কাজটা না-ও হতে পারে। তবে গেলে, ভোর বেলা রেইডে যাওয়া হবে। ইচ্ছে করে এই ভুল সময়টা নিজের সহকর্মীকে জানানোর পিছনেও একটা যুক্তি ছিল। সিনিয়রদের কাছে অরিন্দম শুনেছে, পুলিশে সর্ষের মধ্যেও ভুত থাকে। কাজেই তল্লাশি চালানোর সময়টা আগাম বলে দিলে পাখির কাছে হয়তো খবর পৌছে দিতে পারে কোনও বিশেষ বন্ধু। তাহলেই সব শেষ। এত পরিশ্রম সবই বৃথা হয়ে যাবে।

সোজা ক্যান্টিনে ঢুকে পড়ল এবার। সেঁকা পাউরুটি এবং লাল চা খেতে খেতে সিদ্ধান্ত নিল রাত বারোটাতেই রওনা দেবে। তাহলে পাখিকে ঘরেই পাওয়া যাবে। দ্রুত খাওয়া শেষ করে টাকা মিটিয়ে ফিরে এল মূল ভবনের তিন তলায়। তারপর নিজের মোবাইল ফোনে একটা ইয়ার প্লাগ গুঁজে চালিয়ে দিল গান। কিছু কিছু সময় নিজের উত্তেজনা কমাতে উত্তেজক গান শোনার প্রয়োজন হয়। অফিসে একটা ছোট্ট ঘরে বসে একা একা খানিকক্ষণ শুনল। তিনটে গান শেষ হতেই উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। তারপর নিজেকে তৈরি করে নিল, আরও একটা কঠিন অ্যাসাইমেন্টের জন্য। ভিতরে দেখা হয়ে গেল, তার টিমের বাকি দু’জনের সঙ্গে। মুখোমুখি হতেই তাদের লক্ষ করে বলল, ‘স্যার ফোন করে ছিলেন। পনেরো মিনিটের মধ্যে বেরিয়ে পড়তে বলেছেন। তিনি নিজেই পুরো বিষয়টি মনিটরিং করবেন। রেডি হয়ে নাও সবাই।’ দেখা গেল, ওই দু’জন প্রথমটা একটু অপ্রস্তুত হলেও বসের নাম শোনামাত্র রেইডে বেরিয়ে পড়ার জন্য প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন।

একটা টাটাসুমোতে বসে পড়ল পাঁচজন। গাড়িটা লালবাজারের ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল সাঁ সাঁ করে। রাত তখন সাড়ে দশটা। যত রাত বাড়ে কলকাতার রূপটা যেন বেশি খোলে। সঙ্গে একটা অদ্ভুত মাদকতা জড়িয়ে ধরে শহরটাকে। এটা অরিন্দমের ভালো লাগে। গ্রামে তো বিষয়টা এমন নয়। সবাই যেন দশটার মধ্যে শুয়ে পড়ার জন্য পাগল হয়ে যায়। এখন অবশ্য পরিস্থিতির অনেকটা বদল হয়েছে। সেই গ্রাম আর নেই। রাত জেগে বহু গ্রামের মানুষ এখন সিরিয়াল দেখেন। ইউটিউবে সিনেমা দেখেন। বেলা পর্যন্ত ঘুমিয়েও থাকেন। এসব আজব বিষয় ভাবতে ভাবতে চালককে সে নির্দেশ দিল, একটু ময়দানের দিকে চল। গাড়িতে বসে থাকা বাকিরা তখনও কিছুই বুঝতে পারছিলেন না। ইডেনের কাছে গিয়ে বাবুঘাট হয়ে বাঁদিকে ঘুরে তার কথা মতোই গাড়ি এগিয়ে গেল। রেসকোর্সের দিক থেকে ফের গাড়ি ঘোরানো হল পার্ক সার্কাসের দিকে। গাড়ির ভিতরে বসেই ফোনে কথা বলতে বলতে অরিন্দম নির্দেশ দিল, চার নম্বর ব্রিজের দিকে চল। দ্রুত গাড়ি উঠে গেল ব্রিজের উপর। সেখান থেকে একটু এগিয়ে ডানদিকের রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল গাড়ি।

এলাকার একজনকে ফোন করে অরিন্দম জানতে চাইল, একটা খাবারের দোকানের ঠিকানা। সেই দোকান ছাড়িয়ে, একটা ফাঁকা অন্ধকার জায়গা দেখে রাখা হল গাড়ি। সবাই অবশ্য সাধারণ পোশাক পরেই এসেছিলেন সেদিন। একটু এদিক ওদিক তাকিয়ে তিনজন কোমরে নিজের আর্মসটা গুঁজে সরু গলিটা দিয়ে ঢুকে পড়লেন। অন্ধকারের মধ্যে প্রায় কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। শুধু,বস্তির মতো জায়গাটায় অদ্ভুত একটা বোটকা গন্ধ যেন পেট গুলিয়ে দিচ্ছিল তাদের। অরিন্দম নিজেই এগিয়ে গেল। দেখল, সরু গলিটা যেখানে শেষ হয়েছে, ঠিক সেখানেই একটা কাঠের দরজা। বেশ পুরনো। ভেতর থেকে আটকানো। মুহূর্তের মধ্যেই সে ঠিক করে নিল আগের মতো কাজ করবে না। কড়া ধরে ঠকঠক করে নাড়াতে শুরু করল। ভেতর থেকে এক বৃদ্ধের গলা শোনা গেল, 'কৌন হ্যায়'। এপাশ থেকে উত্তর গেল, 'বসির কা দোস্ত'। দু'মিনিটে খুলে গেল দরজাটা। ঠান্ডা মাথায় অরিন্দম ঢুকে পড়ল। পিছনে আরও দু'জন। বৃদ্ধ বললেন, 'ও তো নেহি হ্যায়'। অভিজ্ঞ পুলিশের সতর্ক দৃষ্টি পরিষ্কার দেখতে পেল, ভিতরে যে উঠোন রয়েছে তার পাশে একটা বাথরুম। বাইরে থেকেই বোঝা যাচ্ছিল সেখানে নড়াচড়া করছেন কেউ একজন।

কিছু জায়গায় আবেগকে কোনও জায়গা দিতে নেই। এক্ষেত্রেও তাই হল। তার ইশারায় একজন বৃদ্ধের মাথায় রিভলবার ঠেকিয়ে পরিষ্কার হুমকির সুরে বলল, 'একদম কথা বলবেন না। তাহলে গুলি চালিয়ে দেব। আমরা লালবাজার থেকে এসেছি। চেঁচামেচিও করবেন না।' বৃদ্ধ সেখানেই পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে গেলেন। অরিন্দম এগিয়ে গেল বাথরুমের দিকে। সেখানকার দরজা এতটাই নড়বড়ে যে দরাম করে একটা লাথ মারতেই একটা পাল্লা খুলে গেল। বাকি কাজটা কঠিন ছিল না। বাথরুমের ভিতরে যে ছিল, ভয়েই কুঁকড়ে গিয়েছিল সে। সুতরাং তাকে টেনে বার করে আনতে ৪৫ সেকেন্ডের বেশি সময় লাগলো না দশাসই চেহারার পুলিশ কর্মীর।

মনে শুধু একটাই চিন্তা ছিল, যদি বাইরের কেউ কোনও ভাবে জানতে পারে তাহলে সমস্যা বাড়বে। ব্যাক আপ টিম কোন অবস্থায় রয়েছে তা-ও জানা সম্ভব ছিল না বাড়ির ভিতর থেকে। এক মিনিট সময়ও তাই নষ্ট না করে বাইরে আসার উদ্যোগ নিল তারা। মাথার সামনে রিভলবার দেখে ততক্ষণে প্রায় নেতিয়ে পড়েছেন ওই বৃদ্ধ। শুধু একবার কনফার্ম করার জন্য তাঁর কাছে চেঁচিয়ে জানতে চাওয়া হল, 'আপকা লড়কা বসির কিতনে দিন সে হিয়া পড় হ্যায়?' বিড়বিড় করে বৃদ্ধ উত্তর দিলেন, 'ও তো মেরা বেটা নেহি হ্যায়। মেরা বেটা বহুত দিন প্যাহেলে জন্নত চলা গিয়া।'

হিসেবটা কেমন যেন গুলিয়ে গেল। তাহলে, যাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছে সে বসির নয়? আচমকা বাকি দু'জনকে অরিন্দম নির্দেশ দিল, 'একটু দাঁড়া।' ধৃতের কলার চেপে ধরা অবস্থাতেই ফের বলল, 'একজন বাইরে গিয়ে ব্যাকআপ টিমটা দেখ। আমি কাজ করছি।' বসিরকে নিয়ে যাওয়া হল একটা ঘরে। মাথায় রিভলবার চেপে ধরে তার কাছে সোজাসুজি জানতে চাইল, 'বল শালা, তুই তাহলে কোন বসির?' যাকে ধরা হয়েছিল, মেরে কেটে তার বয়স ২৮-২৯।

একটু সুযোগ পেয়েই গলার স্বর নামিয়ে সে বলা শুরু করল, 'বুঢঢা যার কথা বলছে সে ওর ছেলে ছিল। তার নাম বসির। আপনারা তার খোঁজেই এসেছেন। ও তো কবেই মারা গিয়েছে। আমার

নাম আসফাক। মনে হচ্ছে কোথাও ভুল করছেন।' সুযোগ পেতেই ঘর থেকে একটা কাগজও এনে দেখালো যুবকটি। এত টানাপোড়েনেও অরিন্দম সিদ্ধান্ত নিল এবার কোনও অবস্থাতেই বসকে ফোন করবে না। নিজেই বিষয়টি সামলাবে। একটানে ঘরের বিছানায় চিৎ করে ওই যুবকটিকে শুইয়ে দিয়ে মাথায় বালিশ চাপা দিয়ে দিল সে। তারপর বলল, 'সত্যি কথাটা বলার জন্য এক মিনিট সময় দিচ্ছি। এবার নিজে ঠিক করে বল। নাহলে, বালিশটা চেপে রাখব, দম বন্ধ হয়ে প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। কোনও দাদা বাঁচাতে আসবে না। আর ওই বুড়ো নিজেই হাফ মরে গিয়েছে। ফলে চিৎকার করে কাউকে ডাকতেও পারবে না।'

কোটিপতি থেকে ভিখিরি, কে চায় মৃত্যু? এটা এমন একটা জিনিস যাকে সবাই ভয় করে। বালিশ চাপা পড়া যুবক বলা শুরু করল, 'একটু জল দিন স্যার, সব বলে দিচ্ছি। আমাকে মারবেন না।' হাত ধরে তাকে টেনে তুলল অরিন্দম। বিছানায় বসিয়ে, ঘরে রাখা বোতলের জল চোখেমুখে ছিটিয়ে দেওয়ার পর নিজে থেকেই বলা শুরু করল সে। 'স্যার, আমার যাওয়ার কথা ছিল বসিরহাট থেকে আনসারকে আনতে। কিন্তু ও ধরা পড়ে গিয়েছে, তা জানতে পেরে, আমি আর যাইনি। আমাকে বলা হয়েছিল ওকে কলকাতা এনে, তারপর হাওড়া স্টেশন অবধি পৌছে দিতে। এর বেশি আমি কিছু জানি না।' এর বেশি জানার দরকারও ছিল না ওদের। বসিরকে একটানে তুলে নিয়ে প্রায় ছুড়ে দিল বাকিদের দিকে। অতক্ষণ বালিশ চাপা থাকার ফলে ওর মুখ দিয়ে তখন আর প্রায় শব্দই বেরোচ্ছিল না। কাজটাও অনেক সহজ হয়ে গিয়েছিল । সরু গলিটা দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে বার করে আনা হল তাকে।

গাড়িও অনেকটা এগিয়ে এসেছিল। তাতে তোলা হল বসিরকে। দ্রুত তারা এগিয়ে চলল লালবাজারের দিকে। এই কাজটাও এত সহজে হয়ে যাবে তা-ও ভাবতে পারেনি অরিন্দমরা। বসিরহাট না হয় গ্রাম। কিন্তু কলকাতার মধ্যে একজনকে তুলে আনা? মনে হচ্ছিল, যেন একটা পকেটমারকে তুলে এনেছে লালবাজারে। কোনও অশান্তি নেই। ঠিক যেন নিখুত চিত্রনাট্য মেনে অভিনয়। যেখানে প্রত্যেক কলাকুশলী তাদের সেরা পারফরমেন্সটা দিয়েছে স্টেজে।

অতরাতে নিজেদের দপ্তরে ঢুকে দেখতে পেল বস নিজের চেম্বারে বসে রয়েছেন। বসিরকে নিয়ে সোজা ঢুকে পড়ল তারা। এবার শুরু হল রাকেশের কাজ। এদিন অবশ্য তিনি শুরুতেই বলে দিলেন, 'তোমরা বাড়ি চলে যাও। রিল্যাক্স করো।' অরিন্দম একটু আগ বাড়িয়েই বলল, 'স্যার। ও স্বীকার করে নিয়েছে আনসারকে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল ওরই।' 'ওয়েল ডান'—প্রত্যুত্তরে বললেন এসটিএফের শীর্ষকর্তা। ফুরফুরে মন নিয়ে লালবাজারের পোর্টিকোতে নেমে এল সে। ততক্ষণে রাত অনেকটাই গভীর হয়েছে। হঠাৎ করে বেজে উঠল পকেটে রাখা মোবাইলটা। হ্যালো বলতেই ওপার থেকে ভেসে এল একজনের গলা। বেশ চেনা চেনা মনে হলেও ঠিক কার গলা বুঝে উঠতে পারছিল না অরিন্দম।

'শোনো না ভাই, আমার একটা কাজ করে দেবে? তুমিই একমাত্র পারবে এটা করে দিতে।'— সেই সম্পাদকের গলা। একরাশ বিরক্তি নিয়ে মাত্র দু'টি শব্দ উচ্চারণ করল, 'কী দরকার?' 'আসলে

আমার মেয়ে বাইরে যাবে। পাসপোর্ট নিয়ে খুব ঝামেলা করছে পুলিশ। তুমি যদি একটু দেখে দাও, তাহলে কাজটা হয়তো হয়ে যাবে। আমার তো পুলিশে খুব একটা জানাশোনা নেই।' মুখে যেন মধু ঢেলেছেন এমন ভাবে কথা বললেন তার প্রাক্তন সেই সম্পাদক। মনে হল, এরকম মানুষের সংখ্যাই আজকালকার দিনে বেশি, যারা দরকার পড়লে পা ধরে ফেলেন। আবার প্রয়োজন মিটে গেলে উঠে দাঁড়িয়ে প্রথম লাথিটা মারেন সাহায্যকারীকেই। পরক্ষণে অবশ্য ভাবল, এই ধরনের লোক যত বেশি তাকে ফোন করবে, নৈতিক জয় তার ততবেশি হবে। সবার সামনে নয়, একা একা এসব ব্যক্তিকে সাহায্যর পর চিমটি কাটা সবচেয়ে বেশি আনন্দের। আগের বার করেনি, কিন্তু এবার কাজটা করে দিয়ে নিজের পুরনো রাগের অনেকটাই তুলে নেবে সে। একটু সময় থমকে গিয়ে, তারপর বেশ গম্ভীর ভাবে জানালো, 'আপনি ফাইল নম্বরটা দিয়ে আমাকে এসএমএস করে দিন। দেখছি।'

ফোনটা কেটে পকেটে রাখার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল এসএমএসটা ততক্ষণে সম্ভবত পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। একবার ভাবল পরে দেখবে। তারপর মনে হল, না কাজটা এগিয়ে রাখা ভালো। তার ব্যাচের এক অফিসার সিকিউরিটি কন্ট্রোলে আছেন। তাঁকে ওটা ফরোয়ার্ড করে লিখে দিল 'এটা একটু তাড়াতাড়ি করে দিতে হবে।'

পরের দিন দুপুরের মধ্যেই ফের এল সেই ফোন,আরও একবার। এবার 'তোমাকে অনেক ধন্যবাদ। তোমার উপকার অনেকদিন মনে রাখব।' আর থাকতে পারল না অরিন্দম। ওপার থেকে কথা শেষ হতেই বলে উঠল, 'আপনি আমার কেন, জীবনে অন্য কারও উপকার কখনও করেছেন? আর যদি করে থাকেন, তাহলে নাম এবং ঠিকানাটা লিখে পাঠাবেন তার বাড়িতে নিজে গিয়ে মিষ্টি পৌছে দিয়ে আসব।' ফোনের ওপারের আওয়াজ থেমে গেল।

এর মধ্যে বস নেমে এসেছেন নীচে। সম্ভবত কোথাও যাবেন। তাই 'ঠিক আছে, পরে কথা বলছি' বলে ফোনটা কেটে দিল সে। গাড়ি এসে দাঁড়াল। তাতে উঠে বেরিয়ে গেলেন রাকেশ। স্যারকে একটা বড়সড় স্যালুট ঠুকে অরিন্দম সোজা ঢুকে পড়ল গোয়েন্দা বিভাগের বিল্ডিংয়ে। সেখানে তাদের বেশ কয়েকজন ব্যাচমেট রয়েছে। একটু আড্ডা দিতে ইচ্ছে হল তার। তবে এই কয়েকদিনের কার্যকলাপে সে এটা বেশ বুঝে গিয়েছে যে, অন্যরা তার সাফল্যগুলো সাধারণ ভাবে নিচ্ছে না। কোথাও যেন একটা রেষারেষির হালকা ছোঁয়া পাওয়া যাচ্ছে অনেকের কথাতে। সাহেব কেন তার উপরেই এত ভরসা করছেন, সেটাও যেন একটা আলোচনার বিষয় ব্যাচমেটদের কাছে। অথচ পুরো ঘটনাক্রমে তার নিয়ন্ত্রণ বা ভূমিকা কোনওটাই নেই। এখনও পর্যন্ত যে ক'টা কাজ তাকে করতে বলা হয়েছিল, সবই সে দক্ষতার সঙ্গে সামলেছে। এমনও তো হতে পারে পরের কাজগুলো ঠিক ভাবে করতে পারল না। তাহলে কি বস এত ভরসা রাখতে পারবেন?

একটা চাপা ভয় যেন চেপে বসে অরিন্দমের উপর। মনে মনে ভাবে, সততার সঙ্গে, সাহসের সঙ্গে কাজ করার যে ফল, তা সাংবাদিকতা করার সূত্রে অজানা নয়। কিছু মানুষের পিছন থেকে ছুরি মারার এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে। যতদিন যাবে এটা বাড়বে, কোনও ভাবে কমবে না। ফলে, এসব নিয়ে ভেবে অযথা সময় নষ্ট করার কোনও মানে হয় না। মুশকিল হল, এসব ছোটখাট হতাশা কাটাতে

অনেকে বোতল খুলে বসে পড়ে। কিন্তু অরিন্দম আবার সে সব থেকে শতহস্তে দূরে। সামান্য সিগারেটেও টান দেওয়া তার স্বভাবে নেই। এজন্য বিভিন্ন জায়গাতে কম কথা শুনতে হয় না তাকে। তবে মনে মনে সে ভাবে, পুলিশে চাকরি করলেই ঘুষ নিতে হবে, আর মাল খেতে হবে, এমন দিব্যি কে দিয়েছে? অনেকেই তো আছেন, এগুলো এড়িয়ে দিনের পর দিন দক্ষতার সঙ্গে চাকরি করছেন।

এসব সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে আবার বেজে উঠল পকেটে রাখা মোবাইল। একরাশ বিরক্তি নিয়ে ফোনটা হাতে নিতেই দেখল, বাড়ি থেকে ফোনটা করা হয়েছে। বাবা-মার বয়স হয়েছে, এখন ছোটখাট কোনও সিদ্ধান্ত নিতেও সমস্যায় পড়েন। তাই সময় নষ্ট না করে কথা বলার বোতামটা টিপল। ওপার থেকে মায়ের গলা। 'হ্যাঁরে, খাওয়াদাওয়া ঠিকমতো করছিস তো? কবে বাড়ি আসবি? অনেকদিন ধরে আসছিস না। এক কাজ কর, সামনের রবিবার একবার একটু বাড়ি আয়।' এক নাগাড়ে কথা বলে মা থামলেন। মুশকিল হল, ছুটি না পাওয়ার কথা কোনও মায়েদেরই বিশ্বাস করানো যায় না। তাঁরা ভেবে বসেন, চাইলেই যে কোনও চাকরি থেকে দিন সাতেকের ছুটি নেওয়া যায়। সাময়িক ভাবে অবস্থাটা সামলাতে মাকে বলল, 'তোমরা কেমন আছো? দেখছি, যদি ছুটি পাওয়া যায় তাহলে যাওয়ার চেষ্টা করছি।' 'ঠিক আছে' মা ফোনটা রেখে দিলেন। কেন হঠাৎ ফোনটা করা হয়েছিল তার কারণটাও বেশ বুঝতে পারল সে। অনেকদিন ধরেই বাড়ির লোকেরা বিয়ে দেওয়ার জন্য উঠে পড়ে লেগেছেন। তাদের যেন আর তর সইছে না।

অথচ অরিন্দমের এখন বিয়েতে মত নেই। সবে নতুন চাকরিতে যোগ দিয়ে একটু কাজের সুযোগ পেয়েছে। এখনই বিয়ে করে নিলে নানা রকম সামাজিকতায় কাজের দফারফা হয়ে যাবে। মন দিয়ে কাজটাও করতে পারবে না, সংসার করাও নয়। ফলে স্যান্ডউইচ হয়ে যাওয়ার হাত থেকে বাঁচাতে হবে নিজেকে। আত্মীয়পরিজনেরা সেটা বুঝছে না, তারা ক্রমাগত মা-বাবাকে বুঝিয়েই চলেছে, তাড়াতাড়ি ছেলের বিয়ে দেওয়ার জন্য।

ক্যান্টিনের দিকে যেতে সে ঠিকই করে ফেলল সামনের সপ্তাহে কিছুতেই বাড়ি যাবে না, কোনও একটা অজুহাত দিয়ে ঠিক এড়িয়ে যাবে, নাহলে ধরে বেঁধে হয়তো তার বিয়েটাই দিয়ে দেবে বাড়ির লোকেরা। সাংবাদিকতা করার সময় জমিয়ে প্রেম করার সময় পেত না। এখন পুলিশের চাকরিতে যোগ দিয়েও নয়। তাই নিয়ে প্রেমিকার সঙ্গে ফোনে কম ঝগড়া তো হয় না রোজ!

পুলিশের চাকরির সঙ্গে সাংবাদিকতার একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। দু'টোই থ্যাঙ্কলেস জব। পুলিশকে যেমন সাধারণ মানুষ গালাগাল করেন, ঠিক তেমনই সাংবাদিকদের পাঠক বা দর্শকরা সব বিষয়েই আজেবাজে কথা বলতে অভ্যস্ত। যেন, এই দুই পেশার লোকেরা মঙ্গলগ্রহ থেকে ভুল করে পৃথিবীতে চলে এসেছেন। আসলে, আজকের ফেসবুক-ট্যুইটারের জমানায় সবাই নিজেদের একজন মরাল পুলিশ অথবা দক্ষ সাংবাদিক ভাবেন। ফলে তাদের যাবতীয় জ্ঞান উগড়ে দেন সোশ্যাল মিডিয়ায়। পাশাপাশি এটাও একটা বিষয় যে, পুলিশ আর সাংবাদিকদের মধ্যেও যেন চিরকাল একটা আকচাআকচির সম্পর্ক। ধরা যাক, একটা খুনের ঘটনা ঘটল, সাংবাদিকরা প্রথম দিনেই সমস্ত সম্ভবনা থেকে একটা খবর লিখলেন। ব্যাস, তাতে খেপে গেলেন পুলিশ কর্তারা। তাঁদের মনে হল, পুলিশের

এক্তিয়ারে ঢুকে পড়ছেন সাংবাদিকরা। মুশকিলের বিষয়, তখন পুলিশের এই বোধটা হারিয়ে যায় যে, একজন সাংবাদিক খবরের কাগজ বা টিভি চ্যানেলে রোজ লড়াই করেন চাকরি বাঁচানোর জন্য। ফলে আজকের দিনে ভয়ঙ্কর প্রতিযোগিতার মাঝে পড়ে খানিকটা বাধ্য হয়েই সাংবাদিকদের অনেক ক্ষেত্রে তদন্তকারীর ভূমিকা নিতে হয়। নাহলে পিছিয়ে পড়ার ভয় সব সময় তাড়া করে বেড়ায়। দু'পক্ষই এটা বুঝলেও, তাদের মধ্যে লড়াইটা চলতেই থাকে। সম্ভবত এটা চলবেও।

কাজ করতে বেশ মজা লাগলেও মাঝে মধ্যে একটা হতাশা যেন হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়। অরিন্দম পজেটিভ চিন্তা ভাবনা করলেও কখনও সখনও ওই হতাশাগুলি কোনও না কোনও ভাবে চেপে বসে। তবে এখন দিনে ডিউটি আর রাতে পুলিশ ট্রেনিং স্কুলে ইভিডি-তে সিনেমা চালিয়ে দেখে সময়ের অনেকটা অংশ কেটে যায়। মাঝে একদিন সাহেব একটি সিনেমার কথা আলোচনা করছিলেন একজনের সঙ্গে। সেটা শুনে ফেলেছিল সে। তারপর বাড়িতে ফেরার পথে একটা সিডি-ও কিনে নেয়। ছবিটার নাম 'সেহার'। এখানেই দেখানো হয়েছে, দেশের মধ্যে প্রথম স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (এসটিএফ) তৈরির বৃত্তান্ত। বারবার ছবিটা দেখেও মনে হয় আরও কয়েকবার অনায়াসে দেখা যায়। বিশেষ করে, আরশাদ ওয়ার্সির অভিনয় মুগ্ধ করে তাকে। ছবিটা দেখলেই ভাবনায় আসে, যদি বাহুবলীদের বিরুদ্ধে অপারেশন করার সুযোগ আসে তাহলে কেমন হয়?

লালবাজারের এই লালবাড়িটায় সাদা পোশাক পরে যারা চাকরি করেন, তাদের সবার মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গর্ব কাজ করে। একটা সময় কলকাতা পুলিশকে স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের সঙ্গে তুলনা করা হত। এখনও কলকাতার লোকেরা মনে করেন, এই পুলিশ বাহিনী চেষ্টা করলেই সব কাজ করতে পারে। দিল্লি, মুম্বই পুলিশের মতো কলকাতা পুলিশের একটা নিজস্ব মর্যাদা রয়েছে। অরিন্দম জানে, কিছুদিন আগে রিজওয়ানুর রহমানের আত্মহত্যার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল উঠলেও এখন তা অনেকটাই কেটে গিয়েছে। সাধারণ মানুষ আবার নতুন করে কলকাতা পুলিশের উপর ভরসা ফিরে পেয়েছেন।

একদিন বস তাঁর ঘরে ডাকলেন অরিন্দমকে। একটা ঠিকানা দিয়ে বললেন, 'এটার ওপর কাজ করো। কিছু পাওয়া যেতে পারে।' আবার যেন অথৈ জলে পড়ল সে। মনে হল, বস তো প্রতিমাসেই নিত্য নতুন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলছে তাকে। কোথা থেকে শুরু করবে। বিষয়টা কি, তা তো কিছুই জানানো হয়নি। বিস্তর ভাবনা চিন্তার পর সেই ঠিকানা ধরে পৌছে গেল একটা বাড়িতে। প্রথম দিন বাইরে থেকে ঘুরে দেখল। পরের দিন, আবার গিয়ে বাড়িটার সামনে দাঁড়াল। আর তখনই একটা অদ্ভুত জিনিস চোখে পড়ল তার। দেখতে পেল, কিছুক্ষণ পর পর বাড়ির গেটটা খুলে যাচ্ছে, আর একজন করে বাইক আরোহী ঢুকছে ভেতরে। সেটা না হয় নতুন কিছু নয়। কিন্তু আধঘণ্টা পরে সেই ব্যক্তি যখন বেরিয়ে আসছেন তার হাতে একটা করে টিফিন ক্যারিয়ার থাকছে। আর আগের পোশাক পাল্টে, নতুন একটা পোশাক পরে অন্য একটি বাইক নিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছেন ওই যুবক। শহরে নতুন ট্রেন্ড, অর্ডার অনুযায়ী খদ্দেরের বাড়ি পছন্দের রেস্তোরাঁ-র খাবার পৌছে দেওয়া। বেশ কয়েকটি সংস্থা এই কাজ করে। তারা অনেক যুবক নিয়োগ করেছে এজন্য। এটাও কি সেরকম?

প্রায় সারাদিন সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যার দিকে ফিরে আসার আগে গুনতে পারল প্রায় ১৫ জন যুবককে ওখানে একবার করে ঢুকতে, একবার করে বেরিয়ে যেতে দেখেছে সে। তাহলে এর পিছনে রহস্যটা কী? পোশাক এবং বাইক কেন পরিবর্তন করছে তারা? রওনা হওয়ার আগে নিজে ঠিক কী করবে, তার একটা নকশাও তৈরি করে নিল মনে মনে। লালবাজারে ঢুকে প্রথমেই গেল বসের ঘরে। তিনি একটা কাজে ব্যস্ত থাকায় বসতে বললেন। একজন সামান্য সার্জেন্ট হয়েও সে যে সরাসরি বসের ঘরে ঢুকতে পারে এটা নিয়েও গোয়েন্দা বিভাগের অন্দরে তখন নানান আলোচনা। পুলিশ মহলে এটা একটা বিরাট সমস্যা। সবাই যেন একটা অদ্ভুত অনিশ্চয়তায় ভোগেন। প্রত্যেকেই মনে করেন তার সহকর্মী যেন বসের কাছে গিয়ে নিজের 'পয়েন্ট' বাড়িয়ে ফেলেছেন। ফলে তাকে নিয়ে শুরু হয় নানান গসিপ। কেউ কেউ অনেক কিছু হাওয়ায় ছড়িয়েও দিতে চায়!

প্রায় মিনিট কুড়ি অপেক্ষা করার পর বসের যেন মনে পড়ল, সামনে কেউ তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। এবার কাজ থামিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, 'কোনও সমস্যা হয়েছে?' এই প্রশ্নটার জন্য তো অরিন্দম রেডি হয়ে আসেনি। আমতা আমতা করে কোনওক্রমে বলতে পারল 'না স্যার, কোনও সমস্যা নেই, কালই কাজটা কমপ্লিট করে ফেলছি।' 'ওকে, বেস্ট অফ লাক।' বস যেন আজ সংক্ষেপেই কথা শেষ করে দিল। ঘর থেকে বেরনোর সময় মনে মনে নিজের ছকটাও তৈরি করে ফেলল। বেরিয়ে যাওয়ার মুখে ফের এবার ঢুকল নিজের দপ্তরে। মুখোমুখি দেখা হয়ে গেল ওসির সঙ্গে। একটা মুচকি হেসে তিনি জানতে চাইলেন, 'কী, কাজটা হল তোমার? তুমি তো এখন স্যারের ব্লু আয়েড বয়।' অরিন্দম জবাব দিল, 'চেষ্টা করছি স্যার, কাজটা তাড়াতাড়ি করার। তবে আমাকে একটা সাহায্য করতে হবে।' 'কী করতে হবে বলো, আমি চেষ্টা করে দেখছি।' উত্তর দিলেন ওসি।

—'আসলে, কাল আমার একটা বাইক দরকার। সিজ করা হলে ভালো হয়। কারণ একটু রিস্ক আছে।' বলল সে।

'ঠিক আছে। আমি ট্রাফিকের রহমানকে বলে দিচ্ছি, তুমি চলে যাও ওর কাছে।' ওসি বললেন। এবার আর অপেক্ষা না করে ট্রাফিক ডিপার্টমেন্টে ঢুকে রহমানের কাছ থেকে একটা মোটামুটি নতুন বাইক পেতে তেমন কোনও অসুবিধা হল না। সেটা নিয়ে খাতায় সই করে তাতে চেপেই বেরিয়ে পড়ল সেদিনের মতো। যাওয়ার আগে রহমানের কাছ থেকেই খোঁজ নিয়ে নিল, পার্ক সার্কাস এলাকার ট্রাফিক গার্ডের ওসি কে। চেয়ে নিল, তাঁর ফোন নম্বরও।

পরদিন সকাল। ট্রাফিক গার্ডের ওসিকে ফোন করে নিজের পরিচয় দিয়ে ওখানকার সার্জেন্টের নম্বরটা সংগ্রহ করল প্রথমে। তারপর ফোন করে তাঁকে জানাল, আজ দুপুরবেলা একটা বাইক (নিজের বাইকের নম্বরটা জানিয়ে) একটা ছোটখাট অ্যাক্সিডেন্ট করবে কংগ্রেস এগজিবিশন রোডের কাছে। তারপর যে বাইকের সঙ্গে ধাক্কা লাগবে সেই বাইকের আরোহীর সামনেই ফোন করবে সার্জেন্টকে। এটাও জানিয়ে রাখল, গোটা ঘটনাটাই এসটিএফের একটা অপারেশনের অঙ্গ।

সকাল দশটার মধ্যে সাধারণ পোশাক পরে বাইকটা নিয়ে বেরিয়ে পড়ল অরিন্দম। অন্য দিনের চেয়ে আলাদা বলতে একটা রোদ চশমা পড়ে নিল সেদিন। যেতে যেতে ঠিক করে নিল নিজের

স্বভাবটা পাল্টে নেবে, কারণ বাইকে উঠলে নিজেকে তো মানুষ বলেই মনে করে না সে। ভাবে, যেন একটা রকেট চালাতে দেওয়া হয়েছে তাকে। এদিন সেই ভুল না করে গান গাইতে গাইতে রওনা দিল গন্তব্যর দিকে। খানিকটা যাওয়ার পর স্বভাব পরিবর্তনের কুফলটা হাতেনাতে টের পেল। যখন হুশ ফিরল, দেখল, ততক্ষণে ধর্মতলার কাছে সিগন্যাল ভেঙে এগিয়ে গিয়েছে অনেকটা। কাছেই এক সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি যেন একশো মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় নেমেছেন, এমন ভাবে তেড়ে এলেন। কাছে এসেই লাইসেন্সটা চাইলেন প্রথমে। তাঁকে দাঁড় করিয়ে রেখে, পিছন পকেট থেকে পার্সটা বার করে নিজের আইডি কার্ডটা দেখালো অরিন্দম। হাতে সেটা নিয়ে সার্জেন্ট দেখলেন। তারপর একটু হাসলেন। অরিন্দম তাঁকে বলল, 'একটা কাজে যাচ্ছি, তাই একটু টেনশনে ভুল করে ফেলেছি।' তাকে অপেক্ষায় না রেখে সার্জেন্ট হাত দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করলেন। আর ভুল না করে এবার এগিয়ে চলল তার বাইক।

পনেরো মিনিটের মধ্যে পৌঁছে গেল সেই বাড়ির সামনে। দূরের একটা চায়ের দোকানের সামনে বাইকটা দাঁড় করিয়ে চায়ের অর্ডার দিয়ে দিল। নজরে এল, দোকানটা অত্যন্ত নোংরা। অস্বাস্থ্যকর। ওসব দেখেই পেটটা যেন গুলিয়ে উঠছিল। কিন্তু এসব ভাবলে চলবে না। এখানে বিকল্প কোনও ব্যবস্থা নেই। আচমকা নজরে পড়ল সাদা টিশার্ট পরা এক যুবক বাইক নিয়ে ঢুকে গেল বাড়ির ভেতর। অরিন্দমের মনে হল, আজ হয়ত তাড়াতাড়ি কাজ মিটবে। এই অখাদ্য চায়ের স্বাদ নিতে হবে না। তার ধারণাটা ভুল প্রমাণ হতে অবশ্য বেশি সময় লাগল না। সেই যুবকের বেরিয়ে যাওয়া বা নতুন কারও আসা যেন বন্ধ হয়ে গেল পরবর্তী দু'ঘণ্টার জন্য।

ইতিমধ্যেই তিনবার চায়ের অর্ডার দিয়ে প্রতিবারই দোকানদারের অজান্তে ফেলে দিয়েছে। বিরক্ত লাগলেও আরও একবার নতুন করে চা বানানোর জন্য অর্ডার করল দোকানদারকে। বেশ খানিকটা দূরে থাকলেও নজরে এল, এক বাইক আরোহী যুবক অন্য একটা বাইক নিয়ে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। এবার আর সেই যুবকের হাতে কোনও টিফিন ক্যারিয়ার নেই। বরং পিঠে একটা ব্যাগ রয়েছে। যা থাকে কপালে ভেবে 'দাদা, টাকা রাখুন' বলে পকেট থেকে একটা পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে তা প্রায় ছুড়ে দিল দোকানদারের উদ্দেশ্যে। তারপর নিজের বাইকটা স্টার্ট করে ঝড়ের গতিতে বেরিয়ে গেল সেখান থেকে। ওই যুবকটি খানিকটা এগিয়ে ছিল। তবু তার পরনে থাকা হলুদ জামাটা চিনে এগিয়ে যেতে খুব একটা অসুবিধে হল না। বাঁদিকে বেঁকে ৪ নম্বর ব্রিজটা পেরিয়ে বেশ খানিকটা এগিয়ে গেল দু'জনে। ট্যাংরা ক্রশিংয়ের কাছে এসে আর ঝুঁকি নিল না। স্পিড বাড়িয়ে ওই বাইকটার খুব কাছে গেল প্রথমে, তারপর পিছন থেকে একটা জোর ধাক্কা মারল বাইকে।

গোটা ঘটনাটা এমন ভাবে ঘটল যে সবাই মনে করলেন কোনও দুর্ঘটনা ঘটেছে। আসলে ধাক্কাটা এত জোরে হয়েছে যে যুবকটি ব্যাগ সমেত ছিটকে পড়েছে বাইক থেকে। আশেপাশের লোকজন ছুটে এসেছেন সেখানে। ছেলেটির হাতে এবং মাথায় আঘাত লেগেছে। রাস্তার পাশে ছুটে আসা বহু পথচারী তার সেবায় ব্যস্ত। এতকিছু হয়ে গেলেও এটা খুবই আশ্চর্যের যে, যুবকটি তার ব্যাগ কিছুতেই পিঠ থেকে খুলছে না। এক ঝলকে সেটা দেখে চট করে মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল

অরিন্দমের। ‘সরি ভাই’ বলতে বলতে তার কাছে চলে গেল। তারপর সবাইকে শুনিয়ে বলল, ‘আমি ট্রাফিক পুলিশকে ফোন করছি। ওকে এক্ষুনি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন।’

কায়দা করে নিজের মোবাইল থেকে এবার ফোন করে দিল সেই সার্জেন্টকে। তিনি তো ফোন পেয়েই সঙ্গে সঙ্গে চলে এলেন। এদিকে, যুবকটি নিজে থেকেই বলা শুরু করল, ‘কোনও সমস্যা নেই আমার, আপনারা আমাকে ছেড়ে দিন। আমি সেলসের কাজ করি। সময় মতো না পৌছতে পারলে বড় সমস্যায় পড়ে যাব।’ ট্রাফিক সার্জেন্ট বললেন, ‘আরে তা হয় নাকি। তাছাড়া এটা পুলিশ কেস করতে হবে। তোমার বাইকটা তো তুবড়ে গিয়েছে।’ অরিন্দমের প্রথম থেকেই টার্গেট ছিল, ব্যাগে কি আছে তা দেখা। এতক্ষণ ধরে ইচ্ছে করেই সে চেষ্টা করেনি। এবার নিজেই যেন উৎসাহ দেখিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, স্যার। আপনি আমাদের বরং আগে থানাতেই নিয়ে চলুন।’

পুলিশকে ঘটনাস্থলে দ্রুত চলে আসতে দেখে, যারা সাহায্যর জন্য এগিয়ে এসেছিলেন তারাও নিজেরা একপা, দু’পা করে সেখান থেকে সরে পড়লেন। একটা রেকার ডেকে দু’টো বাইক তোলা হল। যুবকটি তখনও অনুরোধ করে যাচ্ছে, ‘আমি অফিসে ফোন করেছি, আমাদের ম্যানেজার আসছেন। ওনি এলে তবেই থানায় যাব।’ সেকথা শোনার বান্দা অরিন্দম তো নয়ই, এমনকী সার্জেন্টও নন। প্রায় জোর জবরদস্তি তাকে নিয়ে যাওয়া হল ট্যাংরা থানায়। অরিন্দম ওই সার্জেন্টকে ইশারায় দেখালেন, ছেলেটির ব্যাগটা চেক করতে। দুর্ঘটনার পরে তো বটেই, নিজের পিঠে রাখা ব্যাগটি সে থানাতে এসেও খুলছিল না।



থানার ওসি অলোকবাবুর ঘরে ঢোকার সময় অরিন্দম থানার ডিউটি অফিসারকে নিজের পরিচয় জানিয়ে রেখেছিল। ওরা ঘরে বসার পর ডিউটি অফিসার গিয়ে সরাসরি বললেন, ‘ভাই, তোমার ব্যাগটা দাও তো?’ সবাই তাকিয়ে দেখল ছেলেটি যেন একটু কেঁপে উঠল। বোঝা গেল শিকার ধরতে ভুল হয়নি। তবু নিজেকে বাঁচাতে যুক্তি দিল,‘স্যার, এতে মেডিসিন রয়েছে। খুললে, বাইরের হাওয়া লেগে নষ্ট হয়ে যেতে পারে।’ ডিউটি অফিসার পালবাবু কোনও যুক্তি শোনার বান্দা নন। প্রায় টেনে হিঁচড়ে খুলে নেওয়া হল ব্যাগ। হলুদ জামা পড়া যুবক প্রাণপণ চেষ্টা করেও আটকাতে পারল না কোনও কিছু। মেঝেতে ব্যাগটা রেখে চেনটা টেনে খুলতেই ভেতর থেকে একটা বড় টিফিন ক্যারিয়ার বেরিয়ে এল।

আর তর সইছিল না অরিন্দমের। যুবকটির হাত থেকে প্রথমে তার মোবাইল ফোনটা কেড়ে নিয়ে, তারপর সেই টিফিন ক্যারিয়ারটা বাইরে এনে টান দিয়ে খুলতেই ভিতর থেকে বেরিয়ে এল ঝাঁক ঝাঁক নোটের তাড়া। তার আগে বম্ব ডিটেক্টরে দেখা নেওয়া হয়েছিল কৌটোটি, বলা যায় না যদি বিস্ফোরক থাকে ভিতরে! এত নোট এল কোথা থেকে? ওই যুবক ছাড়া সবাই যেন একসঙ্গে এই প্রশ্নটাই করে ফেললেন। আর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবে যে, সে তখন প্রায় বোবা হয়ে গিয়েছে। একে অপরের দিকে তাকিয়ে যখন রহস্য সমাধানে ব্যস্ত, ঠিক সেই সুযোগ নিয়ে যুবকটি আচমকা চেয়ার থেকে ধপাস করে পড়ে গেল মেঝেতে। পালবাবু ছাড়ার পাত্র নন। এক বোতলের প্রায় অর্ধেক জল মুখে ছিটিয়ে দিয়ে চিৎকার করে বলে উঠলেন, ‘বহু নাটক করেছিল, এবার বল এত টাকা এল কোথা থেকে? ডাকাতি-টাকাতি করেছিস, নাকি পাতা বিক্রি করিস?’ পুলিশ মহলে মাদককে সাধারণত পাতা হিসেবেই বলা হয়। দুঁদে পুলিশ কর্তারা জানেন, এত ক্যাশ টাকা হাতে গোণা কয়েকটি ব্যবসা করলেই শুধু উপার্জন করা সম্ভব। তার মধ্যে মাদকের ব্যবসা অন্যতম। যুবকটিকে মেঝে থেকে টেনে তুলে সাব ইনস্পেক্টর পাল হুমকি দিলেন এ বার, ‘ভালো কথা বলছি। ঠিক করে বল এই টাকা কিসের? এভাবে লুকিয়ে নিয়ে যাচ্ছিস কেন? সত্যি না বললে, পাতা কেসে ফাঁসিয়ে দেব। যতদিন বাঁচবি, ভেতরে পচে মরবি। ভাব, চিন্তা-ভাবনা করে তারপর বল।’ ওসির ঘরের ভেতর এত লোক দেখে খানিকটা ঘাবড়েই গেল ওই যুবক। তারপর গলা নামিয়ে বলতে শুরু করল, ‘আমার নাম কিশোর। পঞ্চাননতলা বস্তিতে থাকি। বাড়িতে বাবা-মা-বোন আছে। উচ্চমাধ্যমিক পাশ করার পর আর পড়তে পারিনি। টাকার অভাবে। বাবা-মা দু’জনেই অসুস্থ। উঠতে পারেন না। একদিন ঢাকুরিয়া স্টেশনে আলাপ হয়েছিল বিশুদার সঙ্গে। ওখানেই পানের দোকান। তিনি বললেন, একটা কাজের কথা। কাজটাও খুব হালকা। রোজ ওখানে গিয়ে এই টাকা নিয়ে ঢাকুরিয়া স্টেশনে বিশুদার দোকানে পৌছে দেওয়া। এর বেশি কিছু আমি জানি না। আর হ্যাঁ, এই পাঁচশো টাকার সব নোটই জাল। শুনেছি বাংলাদেশ থেকে আসে। মালদার এক পার্টির থেকে নিয়ে কেউ একটা পৌছে দিয়ে যায়। আমি স্যার প্রতি ট্রিপে তিনশো টাকা পাই। তবে দিনে খুব বেশি হলে দু’টো ট্রিপ হয়। ওখানে একমাত্র বিশুদাকেই আমি চিনি। আমার কোড নাম ‘চকলেট’।’ ছেলেটার মুখে সব কথা শুনে ওদের মনে হল আর যাই হোক না কেন, কিশোর বর্ন ক্রিমিনাল নয়। তাহলে এত কথা আদায়

করতে ঘাম ছুটে যেত। অরিন্দম এবার মুখ খুলল, 'ঠিক আছে। আমাদের দু'জন অফিসার আসছেন। তাঁদের সঙ্গে তোর বাড়ি গিয়ে দেখব, ঠিকঠাক বলছিস কি না। মিথ্যা বললে বুঝতেই পারছিস, লাইফ বরবাদ হয়ে যাবে।'

আধঘণ্টা পর পঞ্চাননতলা বস্তিতে গিয়ে পৌঁছল কলকাতা পুলিশের গাড়ি। নিজের বাড়ির সামনে পুলিশের গাড়ি থেকে কিশোর নামতেই ভিড় জমে গেল সেখানে। এটাই অবশ্য স্বাভাবিক। কোনও অসুস্থ লোককে পুলিশ নিজেদের গাড়ি করে বাড়িতে পৌছে দিয়ে এলেও এলাকায় চাউর হয়ে যায় নানা রকম গুজব। এক্ষেত্রেও হল তাই। তবে দেখা গেল, কিশোর ভীষণ স্মার্ট। আশপাশে কোনও দিকে তাকালো না সে। একজন পুলিশ কর্মীকে নিয়ে গটগট করে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল। যেহেতু তাকে সরকারি ভাবে তখনও গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি, কাজেই বসের নির্দেশ মেনে তার বাড়িতে সার্চ করতে এল এসটিএফের আরও একটি দল।

একজন রোখাচোখা পুলিশ কর্মীর পক্ষেও অনেক সময় আবেগ সম্বরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। এক্ষেত্রেও তাই হল। ভিতরে ঢুকে দেখা গেল, কিশোরের বাবা শুয়ে রয়েছেন মেঝেতে একটি মাদুর পেতে। দেখে বোঝা যাচ্ছে, উঠে দাঁড়ানোর ক্ষমতা নেই তাঁর। পাশে শুশ্রূষায় ব্যস্ত মা। কিন্তু তাঁরও হাড় জিরজিরে চেহারা। দেখে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, ভীষণ রুগ্ন তিনিও। এসটিএফের দক্ষ অফিসার হিসেবে যথেষ্ট নাম রয়েছে সুমিত সরকারের। তিনি কোনও রকম তাড়াহুড়োয় গেলেন না। অত্যন্ত শান্ত ভাবে কিশোরের মাকে বললেন, 'ঘাবড়ানোর কিছু নেই। শুধু কয়েকটা কথা জানতে আপনাদের এখানে এসেছি। সংসার কীভাবে চলে আপনাদের? একটাই ছেলে?' কিশোরের মা কেঁদে ফেললেন, 'কেন স্যার, আমার ছেলে কি কোনও অন্যায় করেছে?' 'আরে না না, শুধু জানতে চাইলাম।'– পাল্টা বললেন পুলিশ অফিসার। কাঁদতে কাঁদতে কিশোরের মা বলে চলেন, 'স্যার,ও টাকা না নিয়ে এলে আমাদের সংসারটাই ভেসে যাবে। ওর বাবাকে বাঁচাতে পারব না। খাব কি করে? আমাদের কে দেখবে?' চোখ দিয়ে অজান্তেই জল বেরিয়ে এল পুলিশ অফিসারের। শত হলেও তিনিও তো মানুষ। আবেগ জোর করে কতক্ষণই বা ধরে রাখা যায়। কিশোরের মায়ের হাতে পাঁচশ টাকা ধরিয়ে সুমিত বললেন, 'আপনার ছেলে আমাদের সঙ্গে যাচ্ছে। কিচ্ছু চিন্তা করবেন না। ওর কোনও ক্ষতি হবে না। তবে সংসার চালানোর মতো টাকা ঠিক আপনাদের কাছে পৌছে যাবে।' বাইরে বেরিয়ে কিশোরকে সঙ্গে আসা একজন কনস্টেবলকে দিয়ে বসিয়ে রাখা হল গাড়িতে। বসকে ফোন করলেন সুমিতই। পুরো বিষয়টি বর্ণনা করলেন তিনি। সিদ্ধান্ত হল, ওই যুবককে আপাতত লালবাজারে নিয়ে যাওয়া হবে। চলবে টানা জিজ্ঞাসাবাদ। তারপর কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে মূল পাণ্ডা-সহ পুরো চক্রটাকেই তুলে নেওয়া হবে। একজন থানায় চলে গেলেন প্রয়োজনীয় কাগজপত্রে সই করতে। অন্য দুজন কিশোরকে নিয়ে সোজা লালবাজারে এসটিএফের দপ্তরে। অরিন্দম অবশ্য থানা থেকে বেরিয়ে ঢুকে পড়ল লালবাজারে। তার পায়েও সামান্য আঘাত লেগেছে।

খুব বেশি পরিশ্রম করতে হল না। কিশোর যা জানত তার অনেক কিছুই বলল বটে, কিন্তু বোঝা গেল, সে স্রেফ একজন ক্যারিয়ার ছাড়া আর কিছুই নয়। তার ফোনটি এবার ফেরত দিয়ে বলা হল,

অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। জানাতে যে, দুর্ঘটনার ফলে তার বাইকটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এখন সে কী করবে? পুলিশ অফিসারদের কথামতো কিশোর ফোন করল তারই মতো কাজ করা অন্য একজন ক্যারিয়ারকে। ফোনটা করেই বুঝতে পারল বিষয়টা নিয়ে খানিকটা জলঘোলা হয়েছে। ফোনের ওপারে থাকা বাঘা নামে এক যুবক উত্তর দিল, ‘তুই আজ পার্টির কাছে মাল পৌছোসনি, তা নিয়ে হেব্বি ক্যাজরা হয়েছে।’ কিশোর এপ্রান্ত থেকে ফের বলল, ‘যাব কি করে? বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়ে আমার চোট লেগেছে। কেউ তো একবারের জন্যও খোঁজ নেয়নি। মোবাইলটাও ভেঙে গিয়েছে। কোনও রকমে অন্য একজনের সেটে সিম ভরে ফোন করছি। তুই শুধু কাল সকালে একবার জানিয়ে দিস আমি দুপুরের দিকে কাজে যাব। বাইকটা সারাই করতে দিয়েছি।’

ফোনটা কেটে যেতেই পরের দিনের প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলেন এসটিএফের গোয়েন্দারা। বসের কাছে গিয়ে প্রথমে ব্রিফ করা হল পুরো বিষয়টা। কীভাবে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে সেটাও বুঝিয়ে দিলেন রাকেশ। ততক্ষণে বিকেল গড়িয়ে অনেকটা রাত হয়ে গিয়েছে। এবার যে যার মতো বাড়ির দিকে রওনা দেবে। তবে একটা প্রশ্নের উত্তর যে তখনও খোঁজা হয়নি সেটা একজন বাদ দিয়ে কারোর মাথাতেই আসেনি! বসের ঘরে বেলটা একবার বেজে উঠতেই ওসি দৌড়ে গেলেন । তারপর মিনিট দুয়েক সেখানে কাটিয়ে আবার ছুটে এসে ঢুকলেন নিজের ঘরে। অরিন্দমকে ডেকে বললেন, ‘একটা কাজ করলে তা তো সম্পূর্ণ করা উচিত। তোমরা কিশোরকে কি করবে সেই বিষয়ে কোনও সিদ্ধান্ত নিলে? স্যার জানতে চাইলেন আমার কাছে। আমি কিছুই বলতে পারিনি। তোমাদের জন্য এভাবে কতদিন যে সম্মান নষ্ট হবে কে জানে?’

কিছু কিছু ক্ষেত্রে এগুলো খুব সমস্যার। পুলিশের কাজের সঙ্গে এবিষয়ে মিডিয়ার চাকরির একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। কোনও একজন রিপোর্টার, বস মানে সম্পাদকের খুব কাছের লোক হয়ে গেলে চিফ রিপোর্টার তাকে সহ্য করতে পারেন না, তাঁর মধ্যে আজব একটা ইনসিকিউরিটি কাজ করতে থাকে। পুলিশের ক্ষেত্রেও তাই। সে বসের গুড বুকে আছে এটা তার ব্যাচমেটদের মতো ওসিরও না পসন্দ। সুযোগ পেলেই তিনি চিমটি কাটতে ছাড়েন না। মনে মনে রাগ হলেও সেটা পুষে রাখতে হচ্ছিল অরিন্দমকে। তবে কাজের স্বার্থেই সে জানতে চাইল, ‘কেন, সাহেব কিছু বলেছেন নাকি?’ ‘আর বলা? তিনি বললেন, আমরা নাকি ওভার কনফিডেন্সে ভুগছি।’ মুখটা বেঁকিয়ে বললেন ওসি। অরিন্দম বুঝল, ওসি ডাহা মিথ্যা কথা বলছেন। বস ওভাবে কথা বলার লোকই নন। যাই হোক, আপাতত সামনে হাজির হওয়া সমস্যাটা দূর করা প্রয়োজন। তাই বলল, ‘আমার ধারণা, কিশোরকে নিয়ে কি করা হবে সেই কথা বলতে চেয়েছেন সাহেব।’ ‘ও বাবা, তুমি তো দেখছি অন্তর্যামী হে!’ হলুদ ছোপ পড়া ৩২ পাটি দাঁত বার করে হেসে উঠলেন ওসি। সঙ্গে জুড়ে দিলেন, ‘তা তোমার কোনও প্ল্যান আছে কি?’

এ এক মহাসমস্যা। কিছু লোক বরাবর অন্যের ক্ষীর খেয়ে বেঁচে থাকে। এরা মেরুদণ্ডহীন হয়। সাফল্য পেলে নিজের বলে চালাতে চায়। ব্যর্থ হলেই অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রাখতে এক মিনিট দেরি করে না। অরিন্দমের ওসি সাহেব একদম এই গোত্রের। তাঁকে নিজের প্ল্যান সম্পর্কে জানালেই তিনি

দৌড়ে সাহেবের সামনে হাজির হয়ে পুরো বিষয়টা উগড়ে দেবেন। যদি তাতে বস খুশি হয়ে যান তাহলে তো কথাই নেই, 'হুম, আমি এভাবেই প্ল্যানটা করেছি স্যার' বলে আবার ৩২ পাটি বার করে দেবেন। একটু ভেবে অরিন্দম উত্তর দিল, 'চলুন স্যার, ওই ঘরে যাই, দেখি বস কি বলেন?' প্রস্তাবটা শুনেই যেন ৪৪০ ভোল্টের শক লাগার মতো ছিটকে গেলেন ওসি বিশ্বাসবাবু। 'পাগল নাকি, যেতে হলে তুমি যাও, আমি এসবে নেই।' ঠান্ডা মাথায় চেয়ার থেকে উঠে অরিন্দম বলল, 'আমি তাহলে একটু ক্যান্টিনে যাই, ঘুরে এসে বলছি কি করা যায়।' সে এটা জানত, বাইরে গেলেই ওসি তার সম্পর্কে নানা রকম মন্তব্য করা শুরু করবে। কিন্তু, কী করা যাবে। এটা তো পার্ট অফ লাইফ। পৃথিবীতে সবার কাছে ভালো থাকার জন্য সে আসেনি। নিজের কাজটা করে যেতে হবে। ক্যান্টিনে গিয়ে টোস্ট আর চা খেতে খেতে নিজের ছকটা তৈরি করে নিল সে। দাম মিটিয়ে আবার উঠে এল উপরে। তারপর ওসির ঘরে ঢুকে বলল, 'স্যার, একটা কাজ করি। ওকে ছেড়ে রাখি। আমার মন বলছে, পাকেচক্রে ও এই লাইনে চলে এসেছে। আসলে ক্রিমিনাল নয়। তাছাড়া আমরা তো কিশোরকে অ্যারেস্ট দেখাইনি। ফলে বাড়িতে যেতে দিলে ওদের সন্দেহও হবে না। কাল ওকে কাজে লাগানো যাবে আমাদের অপারেশনে। এখন বরং ছোকরাকে খানিকটা শিখিয়ে পড়িয়ে ছেড়ে দিচ্ছি।' ওসি পাল্টা বললেন, 'এটা একবার সাহেবকেও জানানো দরকার। আমিই বা কি করে এত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেব?' কথাটা শেষ করে অরিন্দমকে কার্যত আর কিছু বলতে না দিয়ে ওসি ঢুকে গেলেন রাকেশের ঘরে। বুঝতে দেরি হল না পয়েন্ট বাড়ানোর প্রাণপণ কৌশল শুরু হয়েছে ডিপার্টমেন্টে।

বাইরেই দাঁড়িয়ে রইল সে। খানিকক্ষণ পরই ওসি বাইরে এসে বললেন, 'সাহেব রাজি হচ্ছিলেন না। অনেক বুঝিয়ে শেষ পর্যন্ত রাজি করাতে পারলাম।' পুলিশে চাকরি করাটা কম দিন হল না অরিন্দমের, আজকাল এসব ছোটখাট চালাকি ধরে ফেলতে বেশি সময়ও লাগে না তার। ফলে ওসির উপর-চালাকিটা তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেলেও এক্ষেত্রে চুপ থাকার সিদ্ধান্ত নিল। তারপর নিজের দপ্তরে ঢুকে পড়ল কাজ করতে। কিশোর মাথা নিচু করে একটা চেয়ারে বসে ছিল। 'শোন, তোকে আজকের মতো ছেড়ে দিচ্ছি বটে। তবে মনে করে কাল অন্যদিনের মতোই ওখানে কাজে যাবি। তুই বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা ঢুকব। তার আগে ভেতরে কতজন আছে, তারা ঠিক কী কাজ করছে, সব খানিকটা দূরে গিয়ে আমাকে ফোন করে জানাবি। কথা বলার পর, যেখানে মাল পৌঁছতে বলবে সেখানে রওনা হয়ে যাবি। কিছুটা দূর থেকে আমাদের একজন তোকে ফলো করবে। বাকিটা আমরা বুঝে নেব। বেশি সেয়ানাগিরি করলে রাতে তোর বাড়ি গিয়ে সব ক'টাকে গুলি করে তারপর সেই দোষটা আবার তোরই ঘাড়ে চাপিয়ে ভেতরে ঢুকিয়ে দেব। আর, অন্য কোথাও পালানোর চেষ্টা করলে বুঝতে পারবি তোকে কীভাবে নজরে রাখছি আমরা।'

সামনে গিয়ে কিশোরের পিঠ চাপড়ে বলল অরিন্দম। 'ঠিক আছে স্যার,' উত্তর দিল কিশোর। তারপর আচমকা হাউমাউ করে কেঁদে উঠল, 'স্যার, আপনারা আমার বাড়িতে গিয়ে সবই দেখেছেন। আমি না থাকলে বাবা-মার আত্মহত্যা ছাড়া আর কিছুই করার থাকবে না। ওদের খাবার জোগাড়ের লোক পর্যন্ত নেই। আমি যাতে সমস্যায় না পড়ি তার জন্য যা করতে হয় বলবেন, আমি রাজি আছি।'

বাড়ি চলে যেতে বলা হল কিশোরকে। বস জানতেন পরের দিন রেইডের কথা। কাজেই বাছাই করা কয়েকজনকে নিয়ে তিনি একটি ব্যাকআপ টিম তৈরি করে দিলেন।

আসলে পুলিশ অনেক ক্ষেত্রে বড় মাছকে ধরতে গিয়ে বেশ কিছু চারা পোনা ইচ্ছে করেই বাজারে ছেড়ে রাখে। তবে এখনও পর্যন্ত যা ঘটনাক্রম তাতে কিশোরকে ছেড়ে রাখার ব্যাপারে বসের সিদ্ধান্তটা (আসলে তারও) ঠিক বলেই মনে হচ্ছিল। কিন্তু কে জানত পরের দিনটা বদলে যাবে এভাবে?

সকাল থেকে কিশোরের মোবাইলটাই বন্ধ করা। তবু সে কথা রাখবে এটা ধরে নিয়েই অরিন্দম ব্যাক আপ টিমকে পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টের কাছে গিয়ে রেডি থাকতে বলল, যাতে একবার ফোন করলেই তারা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌছে যেতে পারে। নিজে অবশ্য বাইক নিয়ে আবার সেই আগের চায়ের দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। এদিন চায়ের অর্ডার আর দিল না। আসলে দিনের শুরুটাই কেমন যেন বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছিল আজ কাজটা মসৃণ গতিতে হওয়ার নয়। একঘণ্টা, দু'ঘণ্টা এমনকি তিনঘণ্টা কেটে গেল। কিন্তু কোথায় কে? সেদিনের ছেলেগুলি যেন উধাও হয়ে গেল এলাকা থেকে। কিশোরের মোবাইলে সকাল থেকে অন্তত বার কুড়ি ফোন করে ফেলেছে সে নিজে। প্রতিবারই বলছে ফোন বন্ধ। তাহলে কি একটা ভুল সিদ্ধান্ত চোনা ফেলে দিল গোটা পরিকল্পনায়?

নিজের ওপর বিরক্ত লাগছিল অরিন্দমের। একবার মনে হল নিজেই পকেট থেকে পিস্তল বার করে ভিতরে ঢুকে পড়ে। অবশ্য পরক্ষণেই মন সায় দিল না। এটা বড্ড বেশি ঝুঁকি নেওয়া হয়ে যাবে। এদিকে বেলা বেড়ে চলছিল। দু'টো নাগাদ আর থাকতে না পেরে ফোন করে ফেলল ওসিকেই, 'স্যার, কিছুই বুঝতে পারছি না। কিশোর গদ্দারি করল কিনা, তা-ও আমার মাথায় ঢুকছে না।' মেরুদণ্ডহীন লোকেরা বরাবর এই সব ছোটখাট সুযোগের জন্য অপেক্ষা করে। ফোনের ওপ্রান্ত থেকে আওয়াজ এল, 'আমি আগেই তোমাকে বারবার বলেছিলাম দশবার ভাবো। আরে ভাই, দিনের শেষে একটা ক্রিমিনাল, ক্রিমিনালই থাকে। কয়লাকে ধুলে তার রঙ পরিবর্তন হয় নাকি?' এসব জ্ঞান শুনতে গা রিরি করছিল তার। ভাষণ এড়ানোর জন্য মরিয়া হয়ে বলল, 'একটা ফোন এসে গিয়েছে স্যার, দাঁড়ান আপনাকে রিংব্যাক করছি।' দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ যেমন দ্বিগুণ সাহস নিয়ে ফিরে আসে ঠিক তেমনই অবস্থা হল অরিন্দমের। মোবাইলটার দিকে তিরিশ সেকেন্ড একবার তাকিয়ে সরাসরি ডায়াল করে দিল বসের নম্বরে। বস অবশ্য এক, দুই করে বুঝিয়ে দিলেন এরপর তাদের ঠিক কী কী করতে হবে। ফোনটা কাটার পরই সে পরের কলটা করল পার্ক সার্কাস এলাকায় থাকা তার এক সোর্সকে।

পুলিশের যে কোনও তদন্তে এই ধরনের সোর্সদের একটা বড় ভূমিকা থাকে। সেই সোর্স স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে কেউ হতে পারেন, আবার দুষ্কৃতী দলের সঙ্গে যুক্তও কেউ হতে পারে। পুলিশের পক্ষ থেকে এদের ঠিক বা ভালো কোনও খবর দিতে পারলে সোর্স মানিও দেওয়া হয়। বিভিন্ন জায়গায় এদের বিভিন্ন নামে ডাকা হয়। যেমন মুম্বইয়ে এরা পরিচিত 'খবরি' নামে। তো, কাল্লু নামের

সেই সোর্স ফোন ধরেই বলল,'স্যার বলুন কী কাজ করতে হবে?' 'তোকে একটা ঠিকানা এসএমএস করে পাঠাচ্ছি। ওই বাড়িতে যাবি। কীভাবে ঢুকবি সেটা তোকে ঠিক করতে হবে। তারপর কাজ শেষে বাইরে এসে ফোন করে আমাকে পুরো বিষয়টি জানাবি। বাড়ির সব সদস্য বিশেষ করে ওই বাড়িতে থাকা কিশোর নামে ছেলেটি সম্পর্কে আমার জানা প্রয়োজন।' এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে থামল অরিন্দম। তারপর দ্রুত এসএমএস করে পাঠিয়ে দিল ঠিকানাটা।

বাইকটা নিয়ে একটু এলোমেলো ঘোরা শুরু করল সে। কতক্ষণে পরবর্তী তথ্যগুলো কাল্লু দেবে কে জানে? ঘুরতে ঘুরতে একটা সময় পৌছে গেল ঢাকুরিয়া ব্রিজের ওপর। আমরি হাসপাতালের সামনে থামাল বাইক। হাসপাতালের পাশে চায়ের দোকানগুলিতে তখন বেশ ভিড়। হেলমেটটা খুলে নিয়ে চা আর টোস্টের অর্ডার দিল। ঘড়িটা একবার দেখে নিজেই বলে উঠল, 'কখন যে শালা ফোন করবে কে জানে?' বয়স্ক দোকানদার জানতে চাইলেন, 'কিছু বলছেন আমাকে'। 'না,না,আপনি চা-টা তাড়াতাড়ি দিন।' উত্তরে বলল সে।

কোনও কোনও দিন এমনও যায় যে শুরু থেকে সব কাজে ক্রমাগত নানান বাধা আসতে থাকে। আবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই সব বাধা কেটেও যায়। এইদিনটাও যেন সেরকমই একটা। নানারকম ভাবনাচিন্তা করতে করতে চায়ের কাপটা হাতে নিয়ে তখন সবে একটা চুমুক দিয়েছে অরিন্দম। হঠাৎ বেজে উঠল ফোনটা। পকেট থেকে বার করতেই দেখল কাল্লু। তাড়াহুড়ো করে গ্লাসটা সামনে রাখা বয়ামের ওপর রাখতে গিয়ে বেশ খানিকটা চা উপচে পড়ল গায়ে। কিন্তু এসব সামান্য ঘটনা এখন গুরুত্ব দিলে চলবে না। 'তাড়াতাড়ি বল', ফোনটা কোনওক্রমে ধরে নিয়ে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। তারপর পরবর্তী পাঁচ মিনিট ধরে যা শুনল, তাতে বরং মনটা বড্ড খারাপ হয়ে গেল তার।

কী বলল কাল্লু? 'স্যার, আমি তো আপনার কথা মতো ক্যুরিয়ার সংস্থার কর্মী বলে ওর বাড়ি পৌছে গিয়েছিলাম। খুঁজে বার করতে কোনও অসুবিধে হয়নি। কিন্তু বাড়ির সামনে অত বস্তির লোক দেখে খানিকটা ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। ভিতরে ঢুকে দেখলাম বাঁশ কাটা হচ্ছে। তখনও পুরোটা বুঝিনি। ঘরে গিয়ে দেখতে পেলাম ওই বাড়ির যে ভদ্রমহিলা, তিনি আজ সকালে মারা গিয়েছেন। একটা বুড়ো শুয়ে রয়েছে ওই ডেডবডির পাশে। কিশোর বলে ছেলেটি কেঁদেই চলেছে। আরও একটা কথা শুনলাম স্যার, কাল-পরশু নাকি ওই বাড়িতে পুলিশের লোকেরা গিয়েছিল, তারা চলে আসার পর থেকে এলাকার লোকেরা গিয়ে বারবার জানতে চাইছিল যে ছেলেটি কোনও খারাপ কাজের সঙ্গে যুক্ত কিনা। ওর মা উত্তর দিতে দিতে নাজেহাল হয়ে গিয়েছিল। তারপর অনেক রাতে ছেলেটি বাড়ি ফেরে। আজ সকালে কিশোরের মা মারা যায়। পাড়ার লোকেরা এসে ছেলেটিকেই দোষ দিচ্ছে। আমারও খারাপ লাগছিল তাই বেরিয়ে এলাম।'

অরিন্দম ভাবল একবার বাইকটা নিয়ে কিশোরের সঙ্গে গিয়ে দেখা করে আসে। পরক্ষণেই আবার ভাবল, না, এটা ঠিক হবে না। শুধু কাল্লুকে নির্দেশ দিল, 'তুই জলদি আমরি হাসপাতালের সামনে চায়ের দোকানে চলে আয় তো একবার।' 'ঠিক আছে স্যার' কাল্লু নির্দেশ পালন করতে রাজি হয়ে

গেল। মিনিট দশেকের মধ্যে একটা লড়ঝড়ে স্কুটার নিয়ে চলে এল সে। মনটা হঠাৎ করেই ভীষণ খারাপ হয়ে গিয়েছিল অরিন্দমের। এরকম একটা ঘটনাও যে ঘটে যাবে সেটা একবারের জন্য কল্পনাতেও আসেনি। কাল্লুর স্কুটারটা সামনে দাঁড়াতেই পকেট থেকে একটা পাঁচশো টাকার নোট বার করে তার হাতে দিয়ে অরিন্দম সেটা কিশোরকে পৌছে দিয়ে আসতে বলল। কাল্লুকে জানিয়েও দিল তার টাকাটা কয়েকদিন পর পেয়ে যাবে। সোর্সদের সঙ্গে এই বাকি রাখার বিষয়টার চল রয়েছে পুলিশ মহলে। কথা না বাড়িয়ে ঘাড় নাড়িয়ে সম্মতি দিয়ে কাল্লু রওনা দিল কাছের পঞ্চাননতলা বস্তির দিকে। ইতিমধ্যেই সে বুঝে গিয়েছে আজ বেশি কথা বাড়িয়ে লাভ নেই, স্যারের মুড খারাপ।

মিনিট দশেক একটু থিতু হওয়ার পর মনে পড়ল ব্যাক আপ টিম এখনও সেভেন পয়েন্টের কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার আগে বিষয়টা বসকে জানানো দরকার। একবার ভাবল আবার ফোন করলে বিরক্ত হবেন কি না। তারপর এটাও মনে হল, সারাদিন কি হয়েছে তা না জানালে বস আরও বেশি বিরক্ত হবেন। সুতরাং সব জানানোই বুদ্ধিমানের কাজ। দু'বার রিং হতেই বস ফোনটা ধরলেন। ধৈর্য ধরে সব শুনলেন। নির্দেশ দিলেন ফিরে আসার। অপারেশনটা সেদিনের জন্য স্থগিত রাখা হল। অরিন্দম ফোনটা রাখতে না রাখতে ফের ফোন এল বসের। তিনি কিশোরের মোবাইল নম্বরটা চেয়ে নিলেন। এবার পুরোটা ব্রিফ করার জন্য ফোন সে করল ওসিকে। বসের সঙ্গে কথা বলার বিষয়টা জানানোর পাশাপাশি এটাও জানিয়ে রাখল কন্ট্রোল রুমে ফোন করে ব্যাকআপ ফোর্সকে যেন তুলে নেওয়া হয়।

মিনিট দশেকের মধ্যে কন্ট্রোল রুম থেকে ফোন গেল পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্টে। দিনটা ভালো কাটল না কলকাতা পুলিশের এসটিএফের পক্ষে।

ফের পর দিন। নতুন সকাল। লালবাজারে ঢুকে ওসির সঙ্গে দেখা করল অরিন্দম। কিশোরের ফোনটা আগের রাত থেকেই ট্যাপিংয়ে বসানো ছিল। দেখা গেল এদিন ফোনটা কাজ করছে স্বাভাবিক। বাইরে থেকে অনেকেই ফোন করে কথা বলছে। তবে বেশির ভাগই গুরুত্বহীন। সেগুলো কোনও কাজে লাগার মতো নয়। অরিন্দম এপাশ ওপাশ খানিকটা ঘোরাঘুরি করে ঢুকে পড়ল নিজেদের কন্ট্রোল রুমে। সেখান থেকে ফোন ট্যাপিংয়ের কাজ করা হয়। ইন্সপেক্টর প্রবাল বিশ্বাস একমনে কাজ করে চলেছেন। সাব ইন্সপেক্টর হলেও অরিন্দমের সঙ্গে তার প্রায় বন্ধুর মতো সম্পর্ক। দ্রুত নিজের প্রসঙ্গে ঢুকে পড়ল সে। 'একটু চেষ্টা করে দেখব আমি।' বলল বিশ্বাসকে। 'আরে দেখো দেখো, তোমার সম্পত্তি, তোমাকেই সামলাতে হবে। আমি শুধু শুধু খেটে মরি কেন?' ঠাট্টা করেই জবাব দিল প্রবাল। তবে এই ঠাট্টাতে কোনও অন্য মানে নেই। কানে হেডফোনটা গুজে নিল সে। বিশ্বাস আবার বলল, 'এটা অন্য কেস। ওই কিডন্যাপের কেসটা।' 'সে তো বুঝলাম। বাট আমার মালটার কী হল?' একটু যেন অধৈর্য হয়ে পড়ল অরিন্দম। হতাশাও বেরিয়ে এল, 'খারাপ সময়টা যেন কাটতে চাইছেই না।' তাহলে এই অপারেশনটা কি অসম্পূর্ণ থেকে যাবে?

একদম খাদের ধারে চলে যাওয়া মানুষের ঘুরে দাঁড়াবার জন্য ওপরওয়ালা কিছু না কিছু ব্যবস্থা করে দেন। অরিন্দম উঠে দাঁড়ানোর ঠিক আগের মুহূর্তে কিশোরের নম্বরটা মেশিনে ব্লিঙ্ক করা শুরু

করল। তড়িঘড়ি ওই সুইচটা নিচের দিকে নামিয়ে ফের কানে হেডফোনটা লাগিয়ে নিল। একটা ফোন এসেছে কিশোরের মোবাইলে। তখনও রিং হয়ে চলেছে। পনের সেকেন্ডের মধ্যে ‘হ্যালো, বল’ আওয়াজ দিল কিশোর। ওপ্রান্ত থেকে বলা হল, ‘খবর কী? ঠিক আছে তো?’ হ্যাঁ, কেন? তুই তো কাল এসেছিলি। সবই তো দেখে গেলি।’

ফোনের ওপ্রান্ত থেকে ফের বলা হল, ‘তবে একটা জরুরি কথা ছিল। তুই আমার মতো খোচরগিরি করিস সেটা আমি আগে জানতাম না। কাল প্রথমবার জানলাম।’

—‘মানে কী বলতে চাইছিস? কিছু বুঝতে পারলাম না,’ জবাব দিল কিশোর।

একদিকের গলাটা চেনা তো বটেই কিন্তু ওপারে যে, তার গলাটাও খুবই চেনা লাগছিল অরিন্দমের। একটু সতর্ক হয়ে শোনা শুরু করল। পরবর্তী ৩০ সেকেন্ডের মধ্যেই মন বলল, ‘আরে, এতো কাল্লুর গলা। তার মানে, এই দুজনের কোনও সেটিং কেস আছে নাকি?’ আপাতত দু’জনের কথোপকথন শোনা যাক, এটা ভেবে নিয়ে, হেডফোনটা কানে চেপে ধরতেই পাওয়া গেল কাল্লুর গলা, ‘তোকে লালবাজারের স্যাররা চেনে কীভাবে? কতদিন ধরে ওদের খবর দিস? কাল সব জেনে গিয়েছি। ওরা জানে আসলে তুই কি কাজ করিস?’ এতগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে ধেয়ে আসাতে যেন একটু ঘাবড়ে গেল কিশোর। তারপর নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বলল, ‘দূর। সেদিন আমার বাইকের সঙ্গে ওই মোটা মতো স্যারের বাইকের ধাক্কা লাগে। সেটা বিশুদাও জানে। আমি ছিটকে পড়ে গিয়েছিলাম। বাইকটার ক্ষতি হয়েছিল। সেই থেকে আমাকে চেনেন। তবে উনি আমার কাছে জানতেও চাননি। ফলে আমিও নিজে থেকে কিছু বলিনি। শুধু একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, সংসার কীভাবে চলে এসব। সে সময় জানিয়েছিলাম আমরা খুব গরিব। বাড়িতে বাবা-মাকে দেখতে হয় আমাকেই। ওনার শুনে খারাপ লেগেছিল। সেজন্য হয়তো তোর হাত দিয়ে টাকা পাঠিয়েছে।’ কাল্লু যেন জেরা করছে এমন ভাবে ফের জানতে চাইল, ‘ওখানে বিশুদা বাদ দিয়ে আর কে কে জানে এটা?’ কিশোর জবাব দিল, ‘এটা জানানোর কী আছে? আমি কি তোর মতো দু’দিকে খেলি নাকি? বেশি কথা বলিস না, আমি তোর ভান্ডাফোর করে দিতে পারি।’ দু’জনের কথাবার্তার পুরোটাই রেকর্ডিং হয়ে গেল এসটিএফের কন্ট্রোল রুমে।

দুষ্কৃতীদের নিজেদের মধ্যে যত গন্ডগোল লাগে পুলিশের তত লাভ। তাতে এমন কিছু উঠে আসে যাতে তদন্তের কাজে অনেকটা সুবিধা হয়। ফোনের কথাবার্তা জানতে পেরে লাভ হল অরিন্দমের। তার মানে, চোরে চোরে দেখা যাচ্ছে মাসতুতো ভাই। বিষয়টা ঠিক ভাবে হ্যান্ডেল করতে না পারলে দুই সেয়ানা অন্য কিছু করতে পারে। কথাগুলি মাথাতে ঘুরপাক খেতেই দৌড়ে গেল বসের ঘরের দিকে। গিয়ে হতাশ হতে হল। তিনি কোথাও একটা কাজে বেরিয়েছেন। মুশকিল হল, তিনি না থাকায় আলোচনাটা করতে হবে সেই ওসির সঙ্গে। যার এসব বিষয়ে কোনও ধারণা নেই। শুধু সাফল্যের ভাগ নেওয়া ছাড়া।

অগত্যা, উপায় না থাকায় ঢুকে পড়ল তাঁর ঘরেই। ‘স্যার, এক্ষুনি কন্ট্রোল রুমের মনিটরিং সেলে গিয়ে দেখলাম কিশোর একটু চালাকি করার চেষ্টা করছে। কী করব স্যার?’ ওসি দাঁত বার করে

খানিকটা হাসলেন, তারপর বললেন, কী বলেছিলাম তোমাকে? আমার কথা মিলল তো? এসব আমাদের জানা। এরা এক একটা বিরাট বড় প্লেয়ার। ওকে তুলে আনো। আমি সাহেবের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছি। বাকিটা তোমাকে ভাবতে হবে না।' এতো মহা ফ্যাসাদে পড়া গেল! কোথায় পরামর্শ নিতে এসেছিল, উল্টে দেখা গেল নিজেই ফেঁসে গিয়েছে। তবু নিজে সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিক হবে না ভেবে বসের জন্য অপেক্ষা করাই সেসময় সঠিক বলে মনে হল। দেড়ঘণ্টা পর বস ফিরলেন। পনেরো মিনিট অপেক্ষা করার পর বসের ঘরের আর্দালি বিষ্ণুকে ফিট করা গেল, ভেতরে ঢোকার জন্য। আসলে এরা যেহেতু বারবার যাতায়াত করে সুতরাং তাদের কাছ থেকেই বসের মুডটা বোঝা যায়। বিষ্ণুর খবর অনুযায়ী, বসের মুড নাকি ভালোই। তাই তারও ভিতরে ঢুকতে বাধা এল না। এই ঘরে ঢোকার পর একটা মানসিক শান্ত আসে। নিজেকে যতটা সম্ভব ঠান্ডা করে অরিন্দম জানালো পুরো ঘটনা। বস পুরোটা শুনে তারপর বললেন, 'দু'জনকেই তুলে আনো। আমার মনে হচ্ছে কাল্লুও এই র‍্যাকেটে আছে।' আর ভাবনা চিন্তার কোনও প্রয়োজন ছিল না।

দ্রুত কলকাতা পুলিশের এসটিএফের গাড়ি পৌছে গেল পার্ক সার্কাস আর পঞ্চাননতলা বস্তিতে। কাল্লুর মোবাইল লোকেট করে, কাছে গিয়ে পুলিশ কর্মীরা দেখতে পেলেন সে ভরদুপুরে মাল-টাল টেনে জুয়া খেলতে বসে গিয়েছে। তাতে অবশ্য সুবিধাই হল। একসঙ্গে ওই ঠেক থেকে পাঁচজনকে তুলে এনে বাকিদের দেওয়া হল জুয়া খেলার কেস। আর কাল্লুকে সোজা এসটিএফের ঘরে। কিশোরকে পাওয়া গেল ঢাকুরিয়া স্টেশনের কাছে। সম্ভবত বিশুর কাছে যাওয়ার ছক কষছিল সে। তাকে বলা হল, 'লালবাজার চল, ওখানে কথা আছে।' কিশোর কথা না বাড়িয়ে উঠে পড়ল এসটিএফের টাটা সুমোতে।

আধঘণ্টার মধ্যে গাড়ি পৌছে গেল লালবাজার। সেখানে একটা ঘরে পাশাপাশি বসানো হল দু'জনকে। তারপর শুরু হল তাদের টানা জেরা করার কাজ। যা ভাবা গিয়েছিল, দেখা গেল ঠিক তাই। এই দু'জনই ওই জাল নোট চক্রের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত। কিশোরের মতো যারা ক্যারিয়ারের কাজ করে তাদের বাইরে থেকে নজরদারি করার দায়িত্ব দেওয়া রয়েছে কাল্লুদের। প্রথমে একসঙ্গে, তারপর আলাদা আলাদা ভাবে জেরা করার ফলে বহু তথ্য উঠে এল পুলিশের কাছে। ওসি এগিয়ে এলেন। তিনি দু'জনকে বলে দিলেন, 'আমরা ওই জায়গায় তল্লাশি চালাতে চাই। ফলে তোদের সাহায্য করতে হবে।' ঘাড় নাড়িয়ে কিশোর সম্মতির কথা জানালেও আপত্তি তুলল কাল্লু- 'স্যার, বিরাট লাফড়া হয়ে যাবে, আপনারা আসিফ ভাইকে চেনেন না। ডেঞ্জার লোক। আমরা আছি জানতে পারলে জানে মেরে দেবে।'

এসটিএফের অনেকেই জানতো কাল্লু তাদের এক-দু'জন অফিসারের সোর্স হিসেবে কাজ করে। আর টাকা দিলেও এই সময় সোর্স পাওয়া বড্ড সমস্যার। বেশির ভাগই ভুল তথ্য দিয়ে দেয়, তাতে সময় এবং শ্রম দু'টোই নষ্ট হয়। তবুও দুধ-কলা দিয়ে এদের পুষে রাখতে বাধ্য হন অফিসারেরা। অনেক সোর্স এই সুযোগটা কাজে লাগিয়ে নানা ধরনের অপরাধীদের সঙ্গে ধান্দা ফেঁদে বসে। আড়ালে থেকে কোনও ঘটনার পর পুলিশকে এমন খবর সাপ্লাই করে যে তদন্তকারী অফিসারের

কেস সলভ করতে দম বেরিয়ে যায়। আর কাল্লু এখানে অরিন্দমের একদম এ গ্রেড সোর্স। পাক্কা খবর রাখে।

এবার তাহলে কী করা হবে? যেহেতু একটা সোর্স অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তৈরি করতে হয়, ফলে সব অফিসাররাই চান তাকে বাঁচাতে। কিন্তু অরিন্দম সিদ্ধান্ত নিল, কাল্লুকে বাঁচাতে কিছুই করবে না। কারণ, বোঝা যাচ্ছিল, এই ইস্যুতে বস কোনও একটা কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। এসব কিছুই অবশ্য তার ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। আচমকা একটা দমকা হাওয়া যেন পুরো এসটিএফকে নাড়িয়ে দিয়ে গেল। ঘরে সবার মধ্যে এসে হাজির হয়ে গেলেন বস নিজে। তাঁকে দেখতে পেয়ে বাকিরা খানিকটা পিছু হটে যেন জায়গা করে দিল। ওসি বসে ছিলেন একটা চেয়ারে। হুড়মুড়ি করে উঠে দাঁড়ালেন তিনি। ফাঁকা চেয়ারে বস বসে পড়লেন। তাঁর সামনে পায়ের কাছে দু'জন হাত জোড় করে বসে। 'তো তোমরা দু'জন আমাদের কাজে সাহায্য করবে কি?' জানতে চাইলেন তিনি। সেই গমগমে গলার সামনে কাল্লুর চরমে ওঠা আত্মবিশ্বাস যেন গোত্তা খেয়ে পড়ল মাটিতে। প্রায় শুয়ে পড়ার ভঙ্গিতে সটান বসের পায়ের কাছে মাথা ঠেকিয়ে সে বলে উঠল, 'যা হুকুম করবেন স্যার, আমি করব।' প্রায় কপি করার স্টাইলে কিশোরও এবার শুয়ে পড়ল বসের পায়ের কাছে। তারও মুখ দিয়ে যেন বেরিয়ে এল একই কথা।

ঘরে উপস্থিত সবাই থমকে গেল দু'জনের এই কীর্তি দেখে। মুচকি একটু হেসে বস এবার জানতে চাইলেন, 'তোমরা একে অপরকে চিনলে কী করে?' কিশোর বলল, 'স্যার, ঢাকুরিয়ায় বিশুদার দোকানে একদিন কাল্লুকে দেখতে পাই আমি। সেখানেই আমাদের পরিচয় হয়। বুঝতে পারি আমাদের লাইনের লোক। ও ফোন নম্বর দেয়, আমিও ওকে ফোন নম্বর দিই। আমাদের অফিসে দু'একদিন দেখাও হয়েছে। এর বেশি কিছু নয়।' এবার যেন কাল্লুর পালা। সে বলল,'স্যার, অফিস থেকে এক একজন বাইক নিয়ে যখন বেরিয়ে পড়ে সঙ্গে সঙ্গে আমাকে মোবাইলে ফোন করে জানিয়ে দেওয়া হয়। আমি এই এলাকায় নজর রাখা শুরু করি। তবে একাজ আমি একা করি না, আমার আন্ডারে আরও বেশ কয়েকজন আছে। আসলে, আমাকে দেখে ফেললে ওদের সন্দেহ হতে পারে। তাই আমার ছেলেরা বাইক নিয়ে ফলো করে। এভাবে প্রায় তিনমাস ধরে আমি কাজ করছি। আমার রোজ দু'হাজার টাকা কমিশন মেলে। তার থেকে ১২০০ টাকার মতো ওই এজেন্টদের কমিশন দিতেই চলে যায়।' বেশিক্ষণ বিষয়টাকে না টেনে বস এবার জানিয়ে দিলেন 'কালই অপারেশনটা করে ফেলতে হবে। ততক্ষণ এরা এখানেই থাকুক।'

কাল্লু আর কিশোরকে বলা হল, তাদের লালবাজারে থাকতে হবে, তবে লকআপে নয়। কাল অপারেশনের পর অন্যদের বুঝতে না দিয়ে ওদের ছেড়েও দেওয়া হবে। তারপর আবার নতুন করে অ্যারেস্ট করার পর হালকা কেসে কিছুদিন ভেতরে রেখে জামিনে আবার ছাড়া পাওয়ার ব্যবস্থা করবে পুলিশই। কিন্তু পুরো বন্দোবস্তটা করা হবে অপারেশনে তারা কীভাবে সাহায্য করছে তার উপর। মাথা নেড়ে সায় দিল দু'জনেই। তাদের নিয়ে রাখা হল ভিতরের দিকে একটা ঘরে।

এমনিতে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের কন্ট্রোল রুম-সহ পুরো বিভাগটাই কাজ করে ২৪X৭ এই ঘড়ি ধরে। ওখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় বস বলে গেলেন ওসি এবং অরিন্দমকে তাঁর ঘরে যেতে। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে বস গুছিয়ে বলে দিলেন পুরো পরিকল্পনার কথা। সেই অনুযায়ী অপারেশনের নকশা তৈরি হল। লালবাজারের এই বিভাগে কাজ করার অন্যতম মুখ্য শর্ত ছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে গোপানীয়তা বজায় রাখা। এসটিএফের কাজকর্ম নিয়ে বাইরে আলোচনা করার ক্ষেত্রেও বারণ করে দিয়েছিলেন খোদ রাকেশ। তাঁর একটি বড় গুণ, তিনি বড় কোনও কাজ হলে নিজের নয়, বরং টিম ওয়ার্কের ওপর গুরুত্ব দিতেন। সবার কৃতিত্ব তুলে ধরতেন মিডিয়ার সামনে। বসের নির্দেশে তিনটি আলাদা টিম তৈরি করা হল এই কাজের জন্য। সামনে উপস্থিত তারা দু'জনই শুধু জানতে পারল পরের দিন ঠিক কী হতে চলেছে।

ঠিক সকাল ন'টা। কাল্লু এবং কিশোরকে তোলা হল দু'টি আলাদা গাড়িতে। তবে তাদের এমন ভাবে বসানো হল যাতে বাইরে থেকে কিছুই বোঝা না যায়। নির্দিষ্ট জায়গায় এসে একটু দূর থেকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল দু'জনকে। তারপর তারা হেঁটে ঢুকে গেল বাড়িটার ভেতরে। প্ল্যান অনুযায়ী, এরপর যে ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসবে তাকে খানিকটা দূর পর্যন্ত ফলো করে তুলে নেবে পুলিশ। তারপর প্ল্যান-বি কার্যকর হবে। অপেক্ষা করার আধঘণ্টার মধ্যেই প্রথম কাজটা সহজে হয়ে গেল। যে যুবককে জালে তোলা হল, জানা গেল তার নাম ভাস্কর। তার সঙ্গে কথা বলা শুরু করলেন এক অফিসার। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল দ্বিতীয় পর্যায়ের কাজ। ভাস্করকে নিয়ে আসা হল চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল হাসপাতালের সামনে। সেখানে রাস্তার পাশে তাকে দাঁড় করিয়ে জেরা করা শুরু করলেন এসটিএফের এক গোয়েন্দা। প্ল্যান-সি ততক্ষণে কাজ করতে শুরু করেছে, এবং তা মেনেই গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে কাল্লু আর কিশোরকে। এবার একটা বাইকে তাদের দু'জনকে তুলে দিয়ে বলা হল, ওই রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় ইচ্ছে করেই ভাস্করের সঙ্গে কথা বলতে। তারা তাই করল। সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় হঠাৎ করে বাইক থামিয়ে জানতে চাইল 'কিরে এখানে কী করছিস?'

ভাস্কর তখন অপ্রস্তুত। সাধারণ পোশাকে থাকা পুলিশ কর্মীর দিকে তাকিয়ে সে চেঁচিয়ে উঠল, 'স্যার,ওরাও আমাদের সঙ্গে আছে।' 'এই দাঁড়া, দাঁড়া'—বলে সাজানো চিত্রনাট্য অনুযায়ী ওই অফিসার কাল্লু এবং কিশোরকে থামতে বললেন। কাছে থাকা দুই সাধারণ পোশাকের পুলিশকর্মী যেন এদের ধরার জন্য দাঁড়িয়ে ছিলেন, এমনভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন দু'জনের উপর। তারপর তাদের নিয়ে যাওয়া হল পুলিশ ভ্যানের দিকে। প্ল্যান এ-বি-সি-ডি সবই ঠিকঠাক কাজ করল এসটিএফের। তবে দেখা গেল কাল্লু এদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অভিনেতা। 'সাজানো' গ্রেপ্তারির পর সে ভাস্করের দিকে তাকিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'গদ্দারি করলি তুই। মনে রাখিস, আমি ছাড়া পেয়ে এসে তোকে ছাড়ব না।' অথচ এই বিষয়টা সাজানো চিত্রনাট্যে আদৌ ছিল না। দুই পুলিশ কর্মী এবার 'চল, আগে তো ভেতরে ঢোক' বলে নিয়ে গেলেন ওদের। এবার অপারেশনের শেষ ধাপ। তিনজনকে নিয়ে পুলিশের একটা গাড়ি রওনা দিল গোপন আস্তানার দিকে। তার আগে শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়া হল সদ্য ধরা পড়া

ভাস্করকে। কী সেটা? অন্যান্য দিনের মতোই সে অফিসের ভিতরে যাবে। তারপর নিজের কাজ শুরু করবে। সেই সময় পুলিশের টিম ঢুকবে। ঠিক কতো লোক আছে ওখানে, তা জানার জন্য ভাস্কর ভিতর থেকে কায়দা করে এসএমএস করে দেবে। তার কাজ এই পর্যন্তই। এরপর শুরু হবে এসটিএফের খেলা। আর পুলিশের কথামতো কাজ না করলে পরে সেই হিসেব বুঝে নেওয়া হবে কড়ায়-গন্ডায়।

সামনের শিব মন্দিরে মাথা ঠুকে ঢুকে পড়ল ভাস্কর। ভিতরে গিয়ে দেখতে পেল অন্যদিনের তুলনায় ভিড় বেশি। নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করল, এখন এত লোক কেন? তারপর মনে হল, আজ তো পেমেন্টের দিন। ফলে লোক বেশি থাকা স্বাভাবিক। একটু ভয় ভয় করছিল। তবুও বাথরুমে ঢুকে মোবাইলটা বার করল প্রথমে। তারপর এসএমএস করে দিল, ভেতরে কতজন আছে তা জানিয়ে। মিনিট দশেকও কাটল না, পিলপিল করে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের গোয়েন্দারা ঢুকে পড়লেন। পজিশনও নিয়ে নিলেন দ্রুত।

ভাস্কর ইচ্ছে করেই বাথরুম থেকে আর বেরল না। এদিকে, ঝড়ের গতিতে অপারেশন চালালেন গোয়েন্দারা। কার্যত কোনও প্রতিরোধই এল না বাড়ির ভিতর থেকে। যতটা ভাবা গিয়েছিল, তার চেয়েও সহজে তল্লাশি চালানো শুরু করল এসটিএফ। একটা বেশ বড় জায়গা জুড়ে এখানে জাল নোটের ব্যবসা চলছিল। ভিতরে একটা ছোট্ট খুপড়ির মতো ঘর, সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বেশ কিছু মেশিনপত্র রাখা। লাগোয়া ঘরে মেঝেতে এবং দড়ি টাঙিয়ে থরে থরে নোট ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। দেখে মনে হচ্ছে, সদ্য তৈরি করা হয়েছে এসব। পাঁচশো এবং হাজার টাকার নোটের আদলে অনেক কাগজ কেটে রাখা হয়েছে ঘরের একদিকে। দু'টি স্ক্যানারও রয়েছে সেখানে। দুপুরবেলায় ওখানে পাওয়া গেল সাতজনকে। তাদের মধ্যেই যে একজন বিশু, তা বুঝতে পারল অরিন্দমরা। কোমর থেকে নিজের রিভলবারটা বারও করে ফেলেছিল সে। কিন্তু চালানোর আর সুযোগ পায়নি। তার উপর তিনজন দশাশই চেহারা ঝাঁপিয়ে পড়ায় প্রায় চ্যাপ্টা হয়ে যায়। তবে ব্যাকআপ ফোর্স অসাধারণ কাজ করেছে এদিন। যেভাবে প্রথম টিমটিকে কভার করতে করতে বাড়িতে ঢুকে পড়েছে, তা এক কথায় অনবদ্য।

পুরো কাজটা করতে আধঘণ্টার বেশি লাগল না। যারা ধরা পড়ল, তাদের মধ্যে তিনজন নেতা গোছের। বাকি সবাই ক্যারিয়ার। ঘটনাস্থলে প্রাথমিক ভাবে জেরা করে তিনজনের নাম জানা গেল। বিশুদা বলে যার পরিচয়, তার আসল নাম হারুন রসিদ। বাকিরা রুবেল ইসলাম এবং বিশ্বজিৎ দাস। যদিও এই চক্রের আসল মাথারা সব বসে রয়েছে মালদাতে। এখানে যে কারখানা চলছে, তা আকারে অনেকটাই ছোট। আসল কাজ হয় ওপারে, মানে বাংলাদেশে। সেখান থেকে হাই কোয়ালিটি জাল নোট মহব্বতপুর দিয়ে ভারতে ঢোকে, তারপর তা ছড়িয়ে দেওয়া হয় সারা ভারতে। গত কয়েকবছর ধরে এই সীমান্ত কী পুলিশ, কী বিএসএফ, সবার নজরে পড়ে গিয়েছে। ফলে ওখানকার ধান্দা প্রায় চৌপাট হওয়ার মুখে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে খোদ কলকাতা শহরের এমন একটি জায়গাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। সবাইকে প্রায় চুপিসাড়ে তুলে নেওয়ার পর অরিন্দম খোঁজ শুরু

করল বাড়ির মালিকের। কী করে এতটা নিশ্চিন্তে এমন একটি ব্যবসার জন্য ঘর ভাড়া দিতে পারেন? তিনি থানাতে আদৌ কি জানিয়েছিলেন, যে এই ঘর তিনি অজানা লোকেদের ভাড়া দিয়েছেন? এতগুলো প্রশ্নের সমাধান করে দিল খোদ বিশুই। সে জানাল, বাড়ির আসল মালিক থাকেন মানিকতলা এলাকায়। তাঁর ঠিকানা এবং ফোন নম্বর পাওয়া গেল ধৃত বিশুর কাছ থেকেই। নিজেদের কন্ট্রোল রুমে ফোন করে আগেই আনিয়ে নেওয়া হয়েছিল একটা বড় প্রিজন ভ্যান। তাতে একে একে তোলা হল সকলকে। বাজেয়াপ্ত করা যন্ত্রপাতিও উঠল সেই গাড়িতে। তারপর তা রওনা দিল লালবাজারের দিকে। অরিন্দম-সহ দলের আরও কয়েকজন সদস্য ওখানেই থেকে গিয়েছিল। যদি আরও কিছু পাওয়া যায় সেই আশায়। ঘুরতে ঘুরতে আচমকা মনে পড়ল 'এই রে, এতকিছু হয়ে গেল অথচ ভাস্কর গেল কোথায়? সুযোগ বুঝে ভাগলবা হয়ে গেল না তো?' পকেট থেকে বার করল নিজের সাইলেন্ট করে রাখা মোবাইলটা। তারপর ডায়াল করল ভাস্করের নম্বরে। দু'বার রিং হতেই ভাস্কর ফোনটা ধরে ফিসফিস করে জানতে চাইল 'স্যার, কাজটা হয়ে গিয়েছে?' এপ্রান্ত থেকে বেশ জোরের সঙ্গে অরিন্দম জবাব দিল, 'হয়েছে মানে, সবই তো শেষ। তা, তুই কোথায় ঘাপটি মেরে আছিস?

—'স্যার,আমি বাথরুমে।' পাল্টা উত্তর এল ভাস্করের দিক থেকে।

আর অপেক্ষা করলনা সে। বাথরুমের সামনে গিয়ে ডাকাডাকি না করে দড়াম করে দরজায় একটা লাথি মারতেই পাল্লাটা খুলে পড়ে গেল। ভিতরে দেখা গেল ভাস্কর জবুথবু হয়ে দাঁড়িয়ে।

'বাইরে আয়, তোর চিন্তা নেই। মালগুলিকে প্যাকেটে পুরে লালবাজার পাঠিয়ে দিয়েছি। এবার তুই চল আমাদের সঙ্গে।' অভয় দিল অরিন্দম।

'ঠিক আছে স্যার।' উত্তর দিতে যেন গলা কেঁপে গেল তার। অবশ্য পরক্ষণেই বেরিয়ে এল বাথরুমের ভিতর থেকে। মিনিট পনেরো ঘটনাস্থলে থেকে, তারপর ভাস্করকে নিয়ে লালবাজারের দিকে রওনা হয়ে গেলেন এসটিএফের অফিসারেরা। একটা সফল অপারেশন শেষ হল।

কিন্তু অপারেশন আদৌ শেষ হল কি? লালবাজারে পৌঁছে ধৃতদের সবাইকে ঢুকিয়ে দেওয়া হল সেন্ট্রাল লক আপে। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পুরো ঘটনাটা বসের কাছে ব্রিফ করল সে। এটাও জানাতে ভুলল না যে, বাড়ির মালিকের খোঁজ পাওয়া যায়নি। বসের নির্দেশ এল, একটি টিম বেরিয়ে যাও। তারা ওই ঠিকানা ধরে তুলে আনুক বাড়ির মালিককে। এসব লোককে একটু শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে। আজকের কাজটা সফল ভাবে হয়ে যাওয়ায় আত্মবিশ্বাসটাও বেড়ে গিয়েছিল অরিন্দমের। দ্রুত ঘটনাটা ব্রিফ করে উঠে পড়ল চেয়ার থেকে। তারপর সামনে দাঁড়ানো সাবইন্সপেক্টর অমিতকে নিয়ে রওনা দিল। মানিকতলা পৌঁছে চার নম্বর বাগমারি রোড খুঁজে বার করতে বেশি সময় লাগলো না। সেখানে একটু খোঁজ করতেই জানা গেল রাজা দাসের বাড়ি প্রায় সবাই চেনেন। স্থানীয় ক্লাবের ছেলেরা বেশ আগ্রহ নিয়ে দেখিয়েও দিল সেই বাড়ি। একজন আবার আগ বাড়িয়ে জানাল, 'আসলে উনি আমাদের খুব সাহায্য করেন। ক্যারম বোর্ডটা ওঁর টাকাতেই কেনা হয়েছে। পুজোতেও বড় অঙ্কের টাকাটা উনি দেন আমাদের। তা আপনারা কি লালবাজার থেকে এসেছেন? উনি তো

পুলিশেই বার্গলারি সেকশনে আছেন বলে আমরা জানি।' ক্লাব কর্তার কথাতে একটু টনক নড়ল অরিন্দমের। মানে? কী বলছে লোকটা? জিজ্ঞেস করল, 'রাজা দাস পুলিশে চাকরি করে নাকি?' 'হ্যাঁ, আমরা তো তাই জানি।' ফের জবাব এল। এবার খানিকটা ঘাবড়ে গেল অরিন্দম। দূর, যা আছে কপালে মনে করে ঢুকল রাজার বাড়িতে। কলিংবেলের আওয়াজ শুনে বেরিয়ে এলেন এক বৃদ্ধা। 'কাকে চাই?' সরাসরি প্রশ্ন করলেন তিনি। 'না, মানে রাজাবাবু আছেন বাড়িতে?' এবারের প্রশ্ন উল্টোদিকের। কর্কষ স্বরে উত্তর এল, 'এখন ও বাড়িতে থাকে নাকি? জানেন না আপনারা?' সুতরাং আর কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। ফেরার পথে পাড়ার লোকেদের কাছেই পাওয়া গেল মোবাইল নম্বর। সমাজসেবী বলে কথা! তাই নম্বরও সবার কাছে।

লালবাজারে ঢোকার পথে ওসির ফোন এল। 'কাজটা হয়েছে? আসলে সাহেব জানতে চাইছিলেন।'

অরিন্দম জবাব দিল, 'না স্যার, মালটা বাড়িতে নেই। তবে মোবাইল নম্বরটা মনিটরিং-এ বসালেই বোঝা যাবে কোথায় রয়েছে।' 'তুমি তাহলে একটা কাজ করো। খালি হাতে ফিরে এলে সাহেব খেপে যেতে পারেন, তাই আমি ফোন নম্বরটা মনিটরিং সেলে দিয়ে লোকেশন জেনে নিচ্ছি। তারপর তা তোমাকে জানাচ্ছি। ফোর্স নিয়ে ওখানেই বরং সরাসরি চলে যাও।' নির্দেশ দিলেন ওসি এসটিএফ।

কাঁহাতক আর এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ানো যায়। ততক্ষণে গাড়ি লালবাজারের কাছাকাছি চলে এসেছিল, কিন্তু ভিতরে না ঢুকে গাড়িটা ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছে। ওখানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে তালতলা ক্লাবের ক্যান্টিনে গরম চপ আর চা খেতে খেতে ভেসে উঠল ছোটবেলার স্মৃতি, কলকাতা এলে ইস্টবেঙ্গল মাঠে খেলা দেখতে যাওয়ার কথা। তখন একটা টিকিটের জন্য কত কাকুতি মিনতি করতে হত। আর এখন, চাইলেই টিকিট পাওয়া যেতে পারে, সেই সুবিধা থাকা সত্ত্বেও মাঠে আসতে আর ইচ্ছে করে না। আসলে খেলার মান আগের তুলনায় অনেকটা নেমে গিয়েছে। কোথায় আর সেই সব সোনালি দিনের খেলোয়াড়েরা। ফুটবল বোঝা ইস্তক ইস্টবেঙ্গলের নামটাই শুনেছে নিজের বাড়িতে-পাড়ায়। কল্পনায় দাঁড়ি টানতে দেরি হল না। পকেটে রাখা মোবাইলটা বেজে উঠে ব্যাঘাত ঘটালো চিন্তা-ভাবনায়। বোতামটা টিপে 'বলুন স্যার' বলতে না বলতেই যেন চমক। ওসি বললেন, 'বুঝলে অরিন্দম, তোমার সেই বাড়ির মালিক পার্ক সার্কাস সেভেন পয়েন্ট ধরে যাচ্ছেন। তুমি নিশ্চয়ই কাছাকাছি রয়েছ। রাশ টু দ্য স্পট।' দ্রুত চা আর চপের দাম মিটিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি ছুটল পার্ক সার্কাসের দিকে। যেতে যেতেই ফের ওসিকে ফোন, 'স্যার, আপনি প্লিজ আবার একটু লোকেশনটা বলবেন?' 'দাঁড়াও, বলছি।' ওসি যেন অনেকটাই তৎপর। ফোনটা করার পর এক মিনিট সময় পার হল না। এসটিএফের গাড়ি তখন ফ্লুরিজ ক্রস করেছে। আবার বাজল ফোন। আবার ওসি— 'বুঝলে, পার্ক সার্কাসের ডন বসকো স্কুলের সামনে লোকেশন। মনে হয় জ্যামে আটকে আছে। নাহলে হেঁটে যাচ্ছে।' 'ঠিক আছে স্যার।' বলেই চালককে নির্দেশ, আরও টেনে দে।

মল্লিকবাজারের কাছে এসে রেড সিগন্যাল না মেনে গাড়ি টেনে দেওয়া হল। ওদিকে ফের ওসির ফোন, 'তোমার টার্গেট কিন্তু এখন কংগ্রেস এগজিবিশন রোডের কাছে।'

তাহলে কি রাজা নিজের ভাড়া দেওয়া বাড়িতে কোনও ধান্দা নিয়ে যাচ্ছে? অপারেশনের খবর পৌঁছে গিয়েছে ওর কানে? এখন মনে হচ্ছে ও সত্যি পুলিশ, না হলে এমন নেটওয়ার্ক থাকা সম্ভব নয়। প্রথমে মনে হয়েছিল আগে বসেদের জানাবে না রাজা পুলিশ কর্মী কি না, সেই সন্দেহের কথা। কিন্তু কাছাকাছি এসে মনে হল, না, চালে সম্ভবত কোনও ভুল হয়ে যাচ্ছে। তাই আবার ফোন সেই ওসিকেই। 'স্যার, একটা খবর যদি একটু কনফার্ম করা যায় তাহলে সুবিধা হয়। রাজা দাস নামে কেউ কি বার্গলারি সেকশনে আছে। খোঁজ নিয়ে জানলাম এই লোকটি বোধহয় আমাদের ফোর্সেই আছে।' ততক্ষণে গাড়ি ওই বাড়িটার কাছে পৌঁছে গিয়েছিল। অরিন্দম গাড়িতে থাকা অন্য অফিসারদের বলল, 'চলো, অতিথি মনে হচ্ছে আমাদের ধরা দেওয়ার জন্য নিজেই হেঁটে হেঁটে ঢুকে পড়েছে বাড়িতে।' গেটটা খোলাই ছিল। অবশ্য তাতে কিছু এসে যায় না। কারণ, ভেতরের ঘরগুলি সব সিল করে দেওয়া। প্রথমে কনস্টেবল অরূপকে পাঠানো হল বিষয়টা বুঝে আসার জন্য। ওর মুখটা এমনিতেই ক্যাবলা ধরনের। তার উপর ও অসাধারণ অভিনয় করতে পারে। ফলে অরূপের ফিডব্যাক পেলে ভেতরে ঢোকা সহজ হবে।

আগের অপারেশনে ভাস্কর অনেকটা সাহায্য করেছিল। এবার প্রায় একই ধরনের ভূমিকা নিতে হচ্ছে কলকাতা পুলিশের এই কনস্টেবলকে। অরূপের সিগন্যাল আসতে সময় লাগল না। গাড়িটাকে বাড়ির একদম সামনে নিয়ে গিয়ে শুধু চালক বাদ দিয়ে সবাই ঢুকে পড়ল ভিতরে। হঠাৎ হামলার আশঙ্কায় যে যার মতো পজিশন নিল বটে, তবে তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। একটা লোক কেমন যেন উদাস হয়ে তাকিয়ে দেখছিলেন বাড়িটা। সব দরজা বন্ধ। তাও আবার তালা ঝুলিয়ে সিল করে দেওয়া। পুরো বিষয়টা যেন কেমন ভুতুড়ে ঠেকছিল রাজার কাছে। অরিন্দম নিজেই আস্তে আস্তে এগিয়ে গিয়ে ঘাড়ের কাছে একটা ছোট্ট চাপড় দিল রাজার। আর তাতেই যেন বিদ্যুতের শক খাওয়ার মতো ছিটকে গেলেন তিনি।

সেই সুযোগটা নিয়ে অরিন্দম বলল, 'আরে ভয় পাওয়ার কী আছে? আমরাও তো আপনার মতো পুলিশ।' থতমত খাওয়া রাজা চমকে উঠে প্রশ্ন করে বসলেন, 'আপনি পুলিশ? প্রমাণ আছে কোনও?' হাসতে হাসতে এসটিএফের এক অফিসার বলে উঠলেন, 'এই তো দেখুন, আপনার মতো আমাদের গায়েও লেখা রয়েছে পুলিশ।' রাজা ক্যাবলার মতো চেয়ে রইল। অরিন্দম সামনে গিয়ে নির্দেশ দেওয়ার ঢঙে বলল, 'চলুন তাহলে আমাদের সঙ্গে পুলিশবাবু। একটু লালবাজারটা ঘুরে আসবেন।' 'কেন, আমি আবার কী করলাম? আচ্ছা বলুন তো, এরা সব গেল কোথায়? আজ বাড়ি ভাড়াটা দেওয়ার কথা ছিল।' এক নাগাড়ে বলে এবার থামলেন রাজা। 'চলুন, চলুন, ভাড়া পেয়ে যাবেন। আরে, লালবাজারে তো ওই টাকাই দেওয়া হবে'—প্রায় হুড়মুড় করে টানতে টানতে রাজাকে গাড়িতে তুলে নেওয়া হল। লালবাজারে যাওয়ার পথে গাড়িতেই রাজাকে জেরা করার কাজ শুরু হল 'আপনি কি সত্যি পুলিশ নাকি, এবার বলুন তো।'

'হুম, আমিও পুলিশ ছিলাম। কিন্তু ঘুষ নেওয়ার ঘটনায় প্রথমে সাসপেন্ড হই। তারপর দোষ প্রমাণ হওয়ায় চাকরিটা চলে যায়। তা আপনাদের সবই বললাম, এবার আপনারা অন্তত বলুন আমার বাড়িতে ঠিক কী হয়েছে?' নিজের বিষয়ে এতটা বলে পাল্টা প্রশ্ন করে বসল রাজা। এসটিএফের অফিসারদের প্রশ্ন তখনও শেষ হয়নি। তারা আবার জানতে চাইলেন, 'আপনি কি জানতেন, যাদের বাড়ি ভাড়া দিয়েছিলেন তারা কীসের ব্যবসা করে?'

—'হ্যাঁ, জানতাম। চুক্তিপত্রে তো বলা আছে, ওরা ওষুধের ব্যবসা করবে। কিন্তু কীসের ব্যবসা করছিল আমার বাড়িতে?' আবারও রাজার প্রশ্ন। 'জাল নোটের মানে বোঝেন? সেই নোট তৈরি হত আপনার বাড়িতে।' এসটিএফের গোয়েন্দাদের কাছে এই উত্তর শুনে মুখটা অদ্ভুত রকমের হাঁ হয়ে গেল প্রাক্তন পুলিশ, রাজার। বেশ খানিকটা সময় চুপ করে বসে থাকলেন তিনি। তারপর যেন কিছুটা উদাস হয়েই বলা শুরু করলেন, 'কপালটাই খারাপ আমার। বহু কষ্ট করে এই বাড়িটা কিনেছিলাম। চাকরিটা চলে যাওয়ার পর নিজে একটা বেসরকারি দপ্তরে সিকিউরিটি ম্যানেজারের কাজ জুটিয়ে নিয়েছিলাম। এই বাড়ির ভাড়ার টাকাটা সংসার চালাতে ভীষণ কাজে দিত। এখন কী করি বলুন তো?'

অরিন্দম গম্ভীর হয়ে বলেই ফেলল, 'যা বলার লালবাজারে সাহেবদের সামনে বলবেন। এখন চুপ করে চলুন তো।' সারা রাস্তা আর কোনও কথা হল না। গাড়ি ঢুকে পড়ল কলকাতা পুলিশের সদর দপ্তরে।

লালবাজারে পুলিশ কমিশনারের চেম্বারের ঠিক মাথার ওপরের ঘরটাই এসটিএফের। সেখানে নিয়ে যাওয়া হল রাজাকে। ওখানেই রাখা ছিল বিশু-সহ পুরো দলটাকে। তাদের দেখে যেন অবাকই হয়ে গেলেন রাজা। প্রায় ভেঙে পড়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন,'স্যার। আমার চাকরিটা চলে যাওয়ার পর আর কোনওদিন কোনও খারাপ কাজে যুক্ত হইনি। এরা আমাকে মাসে ২০ হাজার টাকা ভাড়া দেবে বলে চুক্তি করে। বলেছিল, ওষুধ তৈরি করবে। ছ'মাস ধরে ওই বাড়িতে আমি শুধু মাসে একদিন করে যেতাম। ভাড়াটা আনার জন্য। বাইরে থেকে দেখে বোঝা যেত না, এসব কাজ কারবার চলছে ভিতরে। এদের শাস্তি দিন স্যার। এখন তো মনে হচ্ছে ভাড়ার যে টাকা দেওয়া হত সেগুলোও জাল।' চোখেমুখে স্পষ্ট হতাশা তাঁর। রাজার পাড়ায় গিয়েই অরিন্দমরা বুঝে গিয়েছিল লোকটা পাড়াতে একটু বেশি নিজের ঢাক নিজে পেটায় বটে, তবে খারাপ নয়। যারা এই ধরনের কাজে যুক্ত থাকে, তারা আর যাই হোক নিজেদের বেশি এক্সপোজ করার সাহস দেখাবে না। এটা রাজার দোষ যে ভালো ভাবে খোঁজখবর না নিয়ে বেশি টাকা পাওয়ার লোভে এরকম একটা চক্রকে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে।

রাজার ফাইলটা আগেই ঘেঁটে দেখে নিয়েছিলেন পুলিশ কর্তারা। দেখা গেল, লোকটা বেসিক্যালি বোকা। পাঁচ বছর আগে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়ে যায়। যিনি অভিযোগ করেছিলেন, সেই অভিযোগকারী একটু ঢ্যাঁটা টাইপের লোক হওয়ায় রাজার দোষ প্রমাণিত হয় এবং চাকরিটাও চলে যায়। সম্ভবত নিজের পিএফ এবং জমানো টাকা দিয়ে এই বাড়িটা তুলনামূলক কম

দামে কেনেন। সে সময় একজন বয়স্ক লোক ভাড়াটে ছিলেন। তার অবশ্য তিনকূলে কেউ ছিলেন না। বছর খানেকের মধ্যে তিনি মারা যেতেই বাড়ি একবারে ফাঁকা।

তারপর থেকেই ভাড়া বসিয়ে সেই টাকা প্রতিমাসে আয় বাড়াতে সাহায্য করছিল রাজার। বাড়িতে বৃদ্ধা মা। তাঁকে দেখাশোনা করতে গিয়ে বিয়েটাই করে উঠা হয়নি। কিছুক্ষণ ধরে রগড়ানোর পর সাহেবরা সিদ্ধান্ত নিলেন লোকটা সত্যিই ইনোসেন্ট। তবে দাবড়ানি দিয়ে বলা হল, 'এখন বাড়ি যান। কিন্তু দরকার পড়লে ডাকা হবে, তখন আসবেন। না এলে নিজেই সমস্যায় পড়বেন।' এক সাহেব গল্পের ছলে বললেন, বছর আটেক আগে সিবিআইয়ের প্রাক্তন যুগ্ম নির্দেশক উপেন বিশ্বাসের সল্টলেকের বাড়ি থেকে নারকোটিক কন্ট্রোল ব্যুরোর অফিসারেরা একটি মাদক চোরাচালান চক্রের হদিস পান। ওই ঘটনার তদন্তেও জানা গিয়েছিল উপেনবাবুও সত্যিই জানতেন না তাঁর বাড়ির নিচতলায় কীভাবে গড়ে উঠেছে মাদক তৈরির কারখানা। এটা হয়ত তেমন কোনও যুক্তি নয়, তবুও রাজাকে ছাড় দিলেন পুলিশ কর্তারা। তবে, আকারে ইঙ্গিতে বোঝা গেল প্রাক্তন পুলিশ কর্মী রাজা আপাতত লালবাজারের নজরেই থাকবেন।

জাল এই মামলাটা কলকাতায় বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া গেল না। বিশু-সহ বাকিদের জেরা করে উঠে এল, চক্রের আসল মাথারা সবাই প্রায় মালদার লোক। উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় নোট পাচার করার জন্য কলকাতাতে এধরনের একটা কারখানা গড়ে তোলা হয়েছিল। বস অবশ্য হাল ছাড়তে রাজি ছিলেন না। আসল অভিযুক্তরা জেলে থাকলেও কিশোর এবং কাল্লুকে একসপ্তাহ পর জামিন দিয়ে দিল আদালত। মালদার কালিয়াচকের পুরো জাল নোট চক্রের পান্ডাদের ধরার জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হল এসটিএফের অফিসারদের।

তারপর কেটে গেল আরও একমাস। রাকেশ একদিন ডেকে পাঠালেন। হাতে ধরিয়ে দিলেন একটি চিরকুট। সেখানে একটি ফোন নম্বর লেখা। মুখে না বললেও বোঝা গেল এই নম্বরটার উপর নজরদারি চালাতে হবে। একসপ্তাহ ধরে চলল সেই কাজ। প্রথম কিছুদিন নম্বরটা বন্ধ পাওয়া গেল। একদিন হঠাৎ করে দেখা গেল, ফোন নম্বরটি ব্যবহার করা শুরু হয়েছে। কোনও এক সুব্রত ওই ফোনে কথা বলছে। তাতে কোডে কিছু কথা বলা হচ্ছে উল্টোদিকের কাউকে। এই সুব্রতটা আসলে কে? ফোনে যে একজনকে পাওয়া যাচ্ছিল তা বসকে জানানো হল। তিনি নির্দেশ দিলেন, ওর ওপর নজর রাখতে থাকো, নিজেরাই বুঝে যাবে ও আসলে কে।

আরও তিনদিন কাটল। আড়ি পেতে এটুকু বোঝা গেল, জাল নোট চক্রের অন্যতম পান্ডা সুব্রত বেশ বড় মাপের ব্যবসায়ী। তবে কলকাতায় তার গ্যাংয়ের সবাই ধরা পড়ে যাওয়ায়, আবার নতুন করে এখানে একটা টিম তৈরি করতে চায় তারা। সেজন্য প্রয়োজনে কিছুদিন কলকাতা থেকে যেতে আপত্তি নেই তার। এপাশে যাকে এজেন্ট হিসেবে রিক্রুট করা হয়েছে, তার নাম রামু। সে এখন প্রায় রোজই দু'বেলা ফোন করে নানান তথ্য যোগান দিচ্ছে। পর পর কিছুদিন আড়ি পাতার পর বোঝা গেল পরের সপ্তাহেই সুব্রত আসছে কলকাতায়। থাকবে, বাইপাসের ধারে একটি ভাড়া বাড়িতে। এখানে নতুন করে লোকজন নিয়ে কারখানা চালু করে ফিরে যাবে মালদায়। আপাতত তাড়াহুড়ো

করে তার আসার কারণ, আচমকা কালিয়াচক এলাকায় পুলিশের নজরদারি বেড়ে যাওয়া। ফলে কলকাতা এলে একসঙ্গে দুটো কাজই হয়ে যাবে। ঘাপটি মেরে থাকা এবং ব্যবসা বাড়ানো।

নিজের ঘরে ডেকে মনিটরিং সেলের অফিসারদের থেকে পুরো বিষয়টা মন দিয়ে শুনলেন রাকেশ। তিনি বরাবর শোনেন বেশি, বলেন কম। অন্য যে কোনও পেশার সব বসেদের এই স্বভাব অবশ্য নেই। সেটা অরিন্দম বিলক্ষণ জানে। নির্দেশ এল, কলকাতা এলে নতুন করে ব্যবসা শুরুর আগেই কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে চুপিসাড়ে তাকে তুলে নিতে হবে। মনিটরিংয়ের সময়ই দেখা গেল, একই আইইএমআই নম্বর ব্যবহার করে দু'টি সিমের ফোন ব্যবহার করছে সুব্রত। রোজ দু থেকে তিনবার করে কথা হচ্ছে রামুর সঙ্গে।

অবশেষে গৌড় এক্সপ্রেসে শিয়ালদা স্টেশনে নামল এসটিএফের ওয়ান্টেড। অপারেশনটা দ্রুত করতে হবে, খোদ বসের নির্দেশ। অথচ সুব্রত দেখতে কেমন? লম্বা না বেঁটে, তাই নিয়ে কোনও ধারণা নেই পুলিশ কর্মীদের। বিশেষ করে বাইপাসের মতো বড় এলাকায় কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাকে? এই সমস্যাগুলি নিয়ে দফায় দফায় বৈঠক হল এসটিএফে। অরিন্দম সেখানেই জানাল, সে মনিটরিং সেলেই থাকতে চায়। তার প্রস্তাব সবাই তা মেনে নিল।

তখন শীতকাল। একটু রাত বাড়লেই ফাঁকা হয়ে যায় বাইপাসের রাস্তা। শ'য়ে শ'য়ে গাড়ি হুস হুস করে বেড়িয়ে যায় গন্তব্যে। কলকাতা পুলিশের এসটিএফের অফিসারদের তৎপরতা বেড়ে গেল তখনই। কারণ, তাদের জালে পুরে ফেলতে হবে এমন একজনকে যে কলকাতায় একটা স্থায়ী ঘাঁটি তৈরি করতে এসেছে। আজকের মধ্যে না তুলে নিলে কোথা থেকে কী করে ফেলবে তার কোনও গ্যারান্টি নেই। সময় যত গড়াচ্ছিল ততই চাপ বাড়ছিল অফিসারদের মধ্যে। কন্ট্রোল রুমে কানে হেডফোন দিয়ে অরিন্দম অপেক্ষায়, কখন আবার ফোন অন হবে সুব্রতর। অন্যদের তুলনায় বেশ ধূর্ত এই সুব্রত। বেশির ভাগ সময়েই ফোনটা বন্ধ করে রাখে। দরকার পড়লে, লোকেশন পাল্টে কথা বলার পর আবার ফোন বন্ধ করে দেয়। যাতে আগের লোকেশনে গেলে আর খোঁজ না পাওয়া যায়।

নিজে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে অরিন্দম বেশ বুঝতে পারছিল বাইরে তার সহকর্মীরা কীভাবে গরু খোঁজার মতো খুঁজে চলেছে জাল নোট চক্রের পান্ডা সুব্রতকে। রাত সাড়ে দশটা নাগাদ গরম এক কাপ চা নিয়ে সবে এক চুমুক দিয়েছে, নজরে এল সুব্রতর মোবাইল সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তাড়াতাড়ি চা সরিয়ে রেখে কানে হেড ফোনটা চেপে ধরতেই পাওয়া গেল সুব্রতর গলা। ওপারে এক ভদ্রমহিলার কণ্ঠ। সুব্রত তাকে বলছে, 'তুমি যে লাল সোয়েটারটা বুনে দিয়েছিলে সেটা কোথায়? ব্যাগে ভরে দাওনি? এখানে বেশ ভালো ঠান্ডা পড়েছে। আমি একটু বাইরে যাব বাচ্চু এসেছে। বাইকে গেলে বুকে ঠান্ডা লাগে।' চট করে লোকেশনটা দেখে নিল অরিন্দম। কথা বলার ধরণ দেখেই বুঝতে সমস্যা হল না, ওপারে থাকা ভদ্রমহিলা সুব্রতর স্ত্রী ছাড়া আর কেউ নয়। ওই ফোনের টাওয়ার মালদার কালিয়াচকের মহব্বতপুর গ্রাম। তবে সুব্রত নিজের ফোনের টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে উত্তর পঞ্চান্নগ্রামের দিকে।

দ্রুত ওই এলাকায় রাউন্ডে থাকা টিমকে বার্তা পৌছে দিল সে। কিন্তু এতো খড়ের গাঁদায় সূচ খোঁজার মতো। শীতের দিনে সবাই তো সোয়েটার, জ্যাকেট এসব পরে। তাদের মধ্যে সুব্রতকে আলাদা করা মুশকিল। আর উত্তর পঞ্চান্নগ্রামে এখন একাধিক রোস্তোরাঁ। সেখানে বহু লোক বাইরে থেকে শুধু খাওয়াদাওয়া করতেও আসেন। ফলে সামনে থাকলেও সুব্রতকে চেনা মুশকিল। তাহলে উপায় কি?

ফিল্ডে থাকা অফিসারদের এসব প্রশ্নের উত্তর কারও কাছেই আপাতত নেই । তবে কন্ট্রোল রুমে থাকা অরিন্দম সহজে হাল ছাড়তে রাজি ছিল না । সে শুধু অপেক্ষায় ছিল, কখন আরও একবার ফোনটা খুলে কথা বলবে সুব্রত।বেশিক্ষন অধৈর্য হতে হলো না । পনেরো মিনিটের মধ্যে ফের সেই ফোনে কথা। এবার সুব্রত স্ত্রীকে জানাচ্ছে, সে হাতে বোনা লাল রঙের সোয়েটারটা পেয়ে গিয়েছে। কিন্তু এবারে একটা হালকা আওয়াজ আসছে তার খুব কাছাকাছি । দু'হাতে হেডফোনটা কানে চেপে ধরে শব্দটা বোঝার চেষ্টা করলো অরিন্দম । উত্তেজনায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল। তখনই তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় যেন জানান দিল, 'এটা তো ইয়ামাহা আর এক্স হান্ড্রেডের আওয়াজ! তার এক বন্ধুর এই বাইক ছিল।'

কন্ট্রোল রুম থেকে সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা নির্দেশ গেল স্পটে— ‘অল অ্যালার্ট, লাল হাতে বোনা সোয়েটার পড়ে ইয়ামাহা আর এক্স হান্ড্রেডেই রয়েছে টার্গেট, ক্যুইক।’

একজন আবার উত্তর দিল, ‘রাতে কোনও রঙ আলাদা করে চেনা যাচ্ছে না। তবু ট্রাই করছি।’

জাস্ট এই কথাটা শেষ হল, অন্য একটি টিমের সদস্য রাহুল প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, ‘লোকেট করা গিয়েছে। বাইপাস ধরে যাচ্ছে। আমি ফলো করা শুরু করেছি অন্য একটা বাইকে। ব্যাকআপ টিম জিপিএস ধরে আমাকে লোকেট করে এগিয়ে আসতে পারে।’

শুরু হল প্রযুক্তির ব্যবহার। সায়েন্স সিটি অবধি চলল চোর-পুলিশ খেলা। তারপর সুব্রতর বাইক বাঁদিকে টার্ন নিতেই রাহুল এবং তার সঙ্গী বাইকটা পাশে নিয়ে প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল সুব্রতর উপর। এই ঝটকাটা আসবে তা বুঝে উঠতে পারেনি জাল নোট চক্রের পান্ডা। কাজেই ছিটকে গিয়ে পড়ল একদিকে। এতটাই জোরে পড়ল যে আর উঠার মতো শক্তি ছিল না তার। মাথায় হেলমেটও ছিল না। ফলে মাথাতেও আঘাত লাগল সুব্রতর। রাস্তার পাশে বালির একটা উঁচু ঢিবির মতো ছিল। সেখান থেকে টেনে তোলা হল তাকে।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে ব্যাকআপ টিম হাজির হয়ে গেল ঘটনাস্থলে। গাড়িতে সুব্রতকে তুলে নিল তারা। নিয়ে যাওয়া হল সোজা লালবাজারে। লাল রঙের একটি সোয়েটারের সূত্র ধরে জালে তোলা গেল জাল নোট পাচার চক্রের অন্যতম মাথাকে। সুব্রতকে নিজেদের হেফাজতে নিল এসটিএফ। তারপর জেরা করতে গিয়ে তথ্য পাওয়া গেল সুব্রত আসলে একজন বাংলাদেশী। বছর খানেক আগে খুলনা থেকে পালিয়ে এসে মালদাতে সীমান্ত ঘেঁষা গ্রামে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকা শুরু করে। তারপর এপাড়ে বিয়েও করে নেয়। এই অল্প সময়ের মধ্যেই জোগাড় করে ফেলেছে প্যান কার্ড, ভোটার কার্ড

সহ আরও অনেক নথি। সেই কাজে টাকার বিনিময়ে সাহায্য করেছে বাড়ির মালিক। তিনি আবার এলাকার প্রভাবশালী নেতা।

তবে অবাক করা তথ্য জানা গেল সুব্রতকে টানা জেরা করার পর। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআই বাংলাদেশের ভেতর দিয়ে জাল নোট পাঠাচ্ছে এপারে। যাতে এখানকার অর্থনীতিতে ক্ষতি করা যায়। ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউটের একটি সমীক্ষার মাধ্যমে গোয়েন্দারা ততদিনে জানতে পেরেছিলেন এদেশের বাজারে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার জাল নোট ঘোরাঘুরি করছে। ফলে এর একটা বড় অংশ এখানে যে বাইরে থেকে আনা হচ্ছে, তা নিয়ে এসটিএফের গোয়েন্দাদেরও কোনও সন্দেহ ছিল না।

সুব্রতকে জেরা করে এই চক্রের যেসব মাথার নাম জানা গেল, তারা সবাই প্রায় বাংলাদেশের বাসিন্দা। ফলে এসটিএফ বিষয়টি নিয়ে তেমন এগোতে না পারলেও কলকাতা শহরের বুকে জাল নোটের কারখানা তৈরি করার চেষ্টা আটকে দেওয়া গেল। কিন্তু বস এতদিন পর সুব্রতর নম্বরটা পেল কোথা থেকে? প্রশ্নটা এসেছিল তার মনেও। তবে করা হয়ে উঠেনি কাউকে। মাঝে একদিন দেখল ওসির মুড বেজায় ভালো। তখন আলোচনা প্রসঙ্গে নিজের কৌতূহলটা প্রকাশ করে ফেলল। ওসি বিশ্বাসবাবু ফিসফিস করে বললেন,‘ কাউকে বলতে যেও না, তবে ওনি যে জিনিয়াস, তা নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তোমরা কংগ্রেস এগজিবিশন রোডের পুরো বাড়িটা সিল করে এসেছিলে। সাহেব একদিন ওই বাড়িতে একা একা যান, ঘরে ঢুকে এদিক ওদিক ঘুরতে ঘুরতে দেওয়ালে লেখা অস্পষ্ট কয়েকটি মোবাইল নম্বর চোখে পড়ে যায় তাঁর। পেন্সিলে লেখা, প্রায় মুছে যাওয়া সেই নম্বরগুলি নিয়ে কাজ করতে গিয়েই সুব্রতর নম্বরের হদিশ পান। এসব তোমাদের মাথায় খেলবে না।’

অবসর সময়ে বসে অরিন্দম ভাবছিল জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এই ধরনের অপারেশন করার পরও অনেক ক্ষেত্রেই কিছু করার থাকে না। আসল মাথা পর্যন্ত পৌঁছনোই যায় না। ফলে আবার নতুন করে কোনও চক্র গড়ে ওঠে, যারা আবার এই ব্যবসা শুরু করে। এভাবে কখনও এধরনের ব্যবসা বন্ধ করা যায় না, তা বোঝেন পুলিশ মহলের বড়কর্তারা। অথচ কিছু করার নেই, পুলিশ কর্মীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করে যেতেই হয়। সফল না হলে শুরু হয়ে যায় কাগজে-চ্যানেলের চূড়ান্ত সমালোচনা। তা সংক্রমিত হয় অফিসের বড়কর্তা, বাইরে সাধারণ মানুষের মধ্যেও।

আজ তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে গিয়েছিল সে। একটু টিভিটা খুলে আনন্দ চ্যানেল চালিয়ে বসেছিল। তখনই দেখা গেল জঙ্গলমহল থেকে রিপোর্টার দীপের পাঠানো প্রতিবেদন। অরিন্দমের ততদিনে জানা যে, এই রিপোর্টারকে কাজের সূত্রে এখন অশান্ত জঙ্গলমহলে দিনের পর দিন কাটাতে হচ্ছে। কিষেণজি কিংবা জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর সঙ্গে দীপের বেশ ভালো যোগাযোগ। নিয়মিত কথাও হয় তাদের মধ্যে।

অবশ্য কিষেণজি এবং ছত্রধরের এখন একটাই কাজ, শুধু সাংবাদিকদের সঙ্গে রোজ ফোনে কথা বলা। জঙ্গলমহলের খবরটা শেষ হতেই টিভির পর্দায় ভেসে উঠল পরের খবর। যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটা জনসভায় বক্তৃতা করছেন। সেই খবরের শেষে যার নাম

উল্লেখ করা হল তাকে বিলক্ষণ চেনে সে। আসরাফুল। একসময় মুর্শিদাবাদে ছিল। এই চ্যানেলের জেলা সংবাদদাতা হিসেবে। পরে ২০০৬ সাল নাগাদ বহু কর্মী একসঙ্গে ওই চ্যানেল ছেড়ে দেওয়ায় তাকে কলকাতা নিয়ে আসা হয়। জেলায় থাকার সময় একবার এই সাংবাদিকের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল অরিন্দম। যদি তাকে একটা কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়। তা অবশ্য হয়নি। বরং তাকে বিচ্ছিরি ভাবে অপমান করা হয় বলে আজও মনে করে সে। অথচ একটি খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত হিসেবে কংগ্রেস নেতা অধীর চৌধুরীকে যখন গ্রেপ্তার করে আদালতে তোলা হয়, তখন আসরাফুলকে বিভিন্ন ভাবে সাহায্য করেছিল। যা বেমালুম ভুলে গিয়েছে এই সাংবাদিক। তবে এখন মাঝে মাঝে এটাও মনে হয় সাংবাদিকতা ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়াটা ঠিকই হয়েছে। ওই পেশাতেও অনেক বেশি ঝুঁকি নিতে হয়, কিন্তু চাকরির স্থায়িত্ব কেউ দেয় না।

এখানে আর যাই হোক, বিরাট কিছু অপরাধ না করলে চাকরি যাওয়ার ভয় নেই। তাছাড়া কলকাতা পুলিশে চাকরি করলে থাকা যায় এই শহরেই। ঘোরাঘুরি সীমাবদ্ধ ৪৫টি থানা এলাকার ভিতরে। খুব বেশি হলে লালবাজারের কোনও বিভাগে। ২০০৭ সালে রিজওয়ানুর রহমানের আত্মহত্যার ঘটনায় পুলিশের বিরুদ্ধে প্ররোচণার অভিযোগ ওঠার পর থেকে কলকাতা পুলিশে তখন ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধারের কাজ চলছে। ফলে নতুন কমিশনার চাইছিলেন, মানুষের মনে পুলিশ সম্পর্কে একটা ভালো ধারণা গড়ে তুলতে। সেভাবেই কাজ করছিলেন পুলিশ কর্তা-সহ পুরো ফোর্স।

কাজ চলছিলই, সঙ্গে যুক্ত হল বাড়ি থেকে বিয়ের চাপ। ছেলে কলকাতা একা থাকে, ফলে বাড়ির লোকেদের চিন্তা সব সময়েই। তাদের তাড়া খেতে খেতে এবার বিয়ে করার ইচ্ছের কথা জানাতেই হল বাড়িতে। লুকিয়ে প্রায় আট বছর প্রেম করছে সে। যাকে ভালোবাসে তাকেই বিয়ে করতে চায়। নাহলে পরিবারের লোকেদের ক্রমাগত চাপ আর নেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। হবু স্ত্রীকে অবশ্য অনেক আগেই অরিন্দম জানিয়ে দিয়েছিল তার প্রথম প্রেম পুলিশের চাকরি। আর সেখানে ঝুঁকি নেওয়াটা তার স্বাভাবিক স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। এটাও ঠিক, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এই ঝুঁকি নিয়ে আখেরে লাভই হয়েছে। যেমন, আগে তার চাকরির ধরন নিয়ে কোনও ধারণাই ছিল না হবু স্ত্রীর। তিনিও জানালেন, স্বামীর সঙ্গে থাকতে চান কলকাতাতেই। অরিন্দমও একমত হল। বিয়ে করলে পরিবার নিয়ে তো আর পিটিএসে থাকা যায় না। তাই দক্ষিণ কলকাতার ভবানীপুরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে নতুন ভাবে থাকা শুরু হল ব্যাচেলার অরিন্দমের। তবে একটাই শর্ত, এতদ্রুত বিয়ে করতে পারবে না সে। আপাতত আরও কিছুদিন চুটিয়ে কাজ করতে চায়।

এমনিতে এসটিএফের চাকরি নিয়ে যথেষ্ট গর্ব ছিল তার। এই বিভাগটি খুব অল্প দিনের মধ্যে বড় কর্তাদের তো বটেই, খোদ সরকারের নজরে চলে এসেছিল। একাধিক গুরুত্বপূর্ণ মামলায় সফল হয়ে সিআইডির স্পেশাল অপারেশন গ্রুপকেও অনেকটাই পিছনে ফেলে দিয়েছিল এসটিএফ। তবে লালবাজারের কর্তারাও নিজেদের মধ্যে একান্ত আলাপচারিতায় মেনে নিতেন, এসটিএফের শীর্ষে যিনি রয়েছেন তাঁর অসামান্য টিমওয়ার্ক পর পর সাফল্য এনে দিচ্ছে। একদিন দপ্তরে গিয়ে অরিন্দম এক সিনিয়রের কাছে শুনল, ২৬/১১-র এক অজানা তথ্য। মুম্বইতে পাকিস্তানের দশ জন জঙ্গি তাজ

হোটেল এবং নরিম্যান পয়েন্ট-সহ বিভিন্ন জায়গায় হামলা চালায়। তাতে ১৬৮ জন মারা যান। সারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তের গোয়েন্দা সংস্থা এই ঘটনায় নিজেদের মতো করে অনুসন্ধান শুরু করে। কলকাতা পুলিশের খোঁজ খবরে ওই ঘটনায় ব্যবহার করা সিম কার্ডের সঙ্গে কলকাতার যোগসূত্র উঠে আসে। সেই তথ্য জানানো হয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাকেও। তারপর থেকে এসটিএফের দক্ষতার খবর কলকাতার বাইরেও ছড়িয়ে পড়ে।

যদিও প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই বস সেই সব সাফল্যর কৃতিত্ব দিতেন তাঁর জুনিয়রদের। ফলে একটা ঐক্যবদ্ধ টিম হিসেবে সব সময় কাজ করতেন এসটিএফের সদস্যরা। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা দস্তুর হল, কলকাতা পুলিশের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে কোনও সমন্বয় নেই। একে অন্যকে সহ্য করতে পারে না। একজন কাজ করলে অন্য একজন সেই ক্ষীর খেয়ে নেয়। যেমন ধরা যাক, কোনও একটি থানা এলাকায় অপরাধের ঘটনা ঘটল, সেই ঘটনার তদন্তের ভার গোয়েন্দা বিভাগ(ডিডি)-র হাতে দিলে অসন্তুষ্ট হন থানার অফিসারেরা। তারা অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপ পছন্দ করেন না। আবার ডিডির অফিসারেরা সেই তদন্তে সফল হলে আরও সমস্যা। সেই কৃতিত্বের ভাগ কে নেবে, তা নিয়েও শুরু হয় ঝামেলা।

অনেক ক্ষেত্রেই এই বচসা গড়ায় বড় কর্তা পর্যন্ত। ফলে সাংবাদিকদের মতো পুলিশের চাকরিতেও ব্যাপক ভাবে ইগো প্রবলেম কাজ করে। এভাবেই অবশ্য যুগ যুগ ধরে চলে আসছে পুলিশের কাজকর্ম। যা কমেও না, বন্ধও হয় না। অরিন্দমের ক্ষেত্রেও অনেকটা তাই। তার দ্রুত উত্থান মেনে নিতে এখনও কষ্ট হয় নিজেরই ব্যাচমেটদের। সামনে কেউ বলে না বটে। ভিতরে ভিতরে অস্ত্রে শান দেয়। অপেক্ষায় থাকে কখন সুযোগ মিলবে। যদিও সাংবাদিকতা করে আসা অরিন্দম মনে করে পরিশ্রম এবং সততার কোনও বিকল্প নেই। সেটা সাংবাদিকতা হোক বা পুলিশের চাকরি।

# ছদ্মবেশী অনির্বাণ



একদিন লালবাজারে ট্রাফিক বিভাগে একটা কাজে গিয়েছিল অরিন্দম। ওসি এসটিএফ বিশ্বাসবাবুর উত্তেজিত ফোন এল, 'কোথায় তুমি? তোমাকে বড় সাহেব খুঁজছেন। তাড়াতাড়ি ওঁকে একটা ফোন করো। উনি কোনও একটা দরকারে তোমার সঙ্গে কথা বলতে চান।' আচমকাই রক্তচাপটা যেন বেড়ে গেল। বস কেন তাকে খুঁজবেন? তাহলে কি নিজের অজান্তে এমন কোনও কাজ করে ফেলেছে, যা বসের কানে গিয়েছে, এবং তিনি ক্ষুব্ধ? বলা যায় না, এত সব বন্ধুরূপী শত্রু থাকলে নতুন করে কিছু করার প্রয়োজন পড়ে না। মনে খানিকটা আশঙ্কা এবং উত্তেজনা নিয়েই নম্বরটায় ডায়াল করল। 'হ্যাঁ, অরিন্দম, তুমি কোথায় আছো?' ওপার থেকে জানতে চাইলেন রাকেশ। বুকের মধ্যে একটা ধাক্কা লাগল যেন।

খানিকটা আমতা আমতা করে উত্তর দিল, 'স্যার, আমি তো লালবাজারে।' তুমি এখনই ভিক্টোরিয়ার গেটের কাছে চলে এসো তো, দরকার।' ফোনটা বস কেটে দিতেই মনে হল, না, সেরকম কিছু বোধহয় নয়। সিরিয়াস কিছু বিষয় থাকলে ফোনেই বলে দিতেন তিনি। যাই হোক, আপাতত বসের নির্দেশ পালন করতে হবে তাকে। বেশি ভাবনাচিন্তা না করে এক সহকর্মীর লড়ঝড়ে একটা বাইক নিয়ে রওনা দিল ভিক্টোরিয়ার পথে। ফাঁকা রাস্তা থাকায় পৌছতে বেশি সময় লাগল না। গেটের সামনে দাঁড়াতেই ফের বসের ফোন এল, 'তুমি ভিতরে চলে এস। আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি।' দ্রুত বাইকটা পাশে স্ট্যান্ড করে হাঁটতে হাঁটতে ঢুকে গেল সে। টেনশন অবশ্য হচ্ছিল প্রবল। বস কী বলবেন, কে জানে? হয়তো বলে দিতে পারেন, কিছু মনে কোরো না, তোমাকে এসটিএফ থেকে সরিয়ে দিতে হচ্ছে। কিন্তু তা তো হল না। বরং পরবর্তী আধঘণ্টা ধরে বস যা বললেন, তাতে জীবনের মোড় ঘুরে গেল গ্রামের ছেলেটার।

তখন গরমকাল। ফলে ভিক্টোরিয়াতে লোকজন কম। বস তাকে ডেকে নিয়ে বসালেন একটা গাছের নীচে, সিমেন্টের ঢালাই করা চেয়ারে। সামনে দিয়ে একজন চাওয়ালা যাচ্ছিল। তাকে ডেকে দু'টো কফি দিতে বললেন। বোঝা গেল, আরও কোনও একটা গুরুত্বপূর্ণ অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে অরিন্দমকে। টেনশনটা কাটাতে ঢক ঢক করে গরম কফিটা খেয়ে ফেলল। ততক্ষণে উত্তেজনায়

ঘামতেও শুরু করেছিল সে। রাকেশ সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি ঘাড়ে হাত দিয়ে বললেন,'আমরা জঙ্গলমহল নিয়ে এবার কাজ শুরু করব। তাতে তোমাকে গুরুত্বপূর্ণ রোল নিতে হবে। ঠিক কী করতে হবে, তা আমি ব্রিফ করে দেব। সেই প্ল্যান অনুযায়ী কাজ শুরু করবে। এতে ফ্রিহ্যান্ড পাবে তুমি।'

একবছর ধরে লালগড় আন্দোলনকে ঘিরে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে তিনটি জেলা। তার রেশ পড়েছে রাজ্যের অন্যান্য জায়গাতেও। মাওবাদী নেতা কিষেণজি, বিকাশ এবং জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো ততদিনে পুলিশকে কার্যত ল্যাজে খেলানো শুরু করেছেন। সরকারের হাতে থাকা এমন কোনও বাহিনী নেই যে তাদের ব্যবহার করা হয়নি, জঙ্গলমহল শান্ত করার কাজে। লাভ যদিও কিছুই হয়নি। উল্টে ছত্তিশগড়ের কায়দায় স্থানীয় বাসিন্দাদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দিয়ে গণমিলিশিয়া তৈরি করেছে মাওবাদীরা। তারাই এখন হাতে অস্ত্র নিয়ে যাকে খুশি খুন করে চলেছে। সরকারের কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই ওইসব এলাকায়। এমনকী, জনসাধারণের কমিটি তাদের কোর এলাকায় পুলিশ বয়কটের ডাক পর্যন্ত দিয়ে রেখেছে। ফলে পুলিশ লালগড় থানার বাইরে আর কোথাও যেতে পারছে না। এসবের মধ্যেই জুন মাসে মাওবাদীদের সাহায্য নিয়ে জনসাধারণের কমিটির স্কোয়াড সদস্যরা ধরমপুর দখল করে নিল সিপিএমের সশস্ত্র বাহিনীর সঙ্গে টানা দু'দিন লড়াই করার পর। ওই মাসের ১৬ তারিখ মেদিনীপুরের সার্কিট হাউজে যখন রাজ্য প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করছেন ছত্রধর মাহাতোরা, ঠিক তখনই দোর্দণ্ডপ্রতাপ সিপিএম নেতা অনুজ পান্ডের বাড়ি ভেঙে গুড়িয়ে দেয় মাওবাদী দলের সশস্ত্র স্কোয়াড। সেই ঘটনার নেতৃত্বে দিলেন মাওবাদী নেতা বিকাশ। ওই দিনই প্রথম টিভি চ্যানেলের ক্যামেরার উল্টোদিকে মুখ করে সাক্ষাৎকার দিতে দেখা গেল বিকাশকে। যাতে মাওবাদীদের নানা পরিকল্পনার কথাও ঘোষণা করলেন তিনি। এই সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হওয়ার দু'দিনের মধ্যে রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি কেন্দ্রীয় বাহিনী চেয়ে পাঠাল। ছত্তিশগড়ের ধাঁচে এ রাজ্যেও শুরু হয়ে গেল 'অপারেশন গ্রিন হান্ট'।

বড় সাহেবদের আলোচনা থেকে অরিন্দম কানাঘুষোয় শুনতে পেয়েছিল, তাদের এলাকা না হলেও কলকাতা পুলিশের এসটিএফকে জঙ্গলমহলের অপারেশনে কাজে লাগাতে চাইছে সরকার। মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্রসচিবরা, মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনা করে ঠিক করেছেন, অনেক হয়েছে আর নয়। কিষেণজি, বিকাশ এবং ছত্রধরকে আর বাড়তে দেওয়া হবে না। মহাকরণে সরকারি আমলাদের সঙ্গে পুলিশের শীর্ষ কয়েকজন কর্তার দীর্ঘ আলোচনার পর ঠিক হল, যেভাবে এই তিনমূর্তি ওই এলাকায় অরাজকতা তৈরি করতে চাইছে, তা বন্ধ না করলে ভবিষ্যতে সমস্যা আরও বাড়বে।

কিন্তু কী ভাবে? ওভারঅল বিষয়টি দেখভালের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হল যুগ্ম কমিশনার (এসটিএফ) রাকেশ কুমারকে। তিনি নিজের মতো করে স্বাধীন ভাবে বেছে নিতে পারবেন তাঁর টিম। সিগন্যাল পাওয়ার পর আর দেরি না করে রাকেশ শুরু করলেন দল সাজানোর কাজ। তখনই তাঁর মনে পড়ল অরিন্দমের নাম। কলকাতা পুলিশের এই সার্জেন্টের কাজকর্ম সম্পর্কে অবগত আইপিএস কর্তা রাকেশ। একদম 'খারুশ' অফিসার। ভরসা রাখা যায় ছেলেটার উপর। ওর সঙ্গে আর

দু'একজনকে দিয়ে কাজটা করাতে হবে। তবে তারও আগে গ্রাউন্ডওয়ার্ক ভালো ভাবে করা ভীষণ জরুরি।

বস বলে দিয়েছেন, কাজেই তাতে নিজস্ব মতামত থাকতে পারে না। এক্ষেত্রেও হল তাই। কয়েকদিনের মধ্যে জঙ্গলমহল সংক্রান্ত বেশ কয়েকটা বই কিনে ফেলল সে। এই বইগুলি পড়া দরকার। যারা আন্দোলন করছে, তাদের সম্পর্কে না জানলে ওখানে কাজ করা মুশকিল হয়ে যাবে। তাছাড়া ভুল তথ্য জানলে সমস্যায় পড়তে হতে পারে। আপাতত তাই কিছু বই আর কাগজে প্রকাশিত বিভিন্ন প্রতিবেদন পড়ে নিজেকে এই সম্পর্কে দক্ষ করে তোলার কাজ শুরু করল অরিন্দম। নকশাল আন্দোলন নিয়ে এই প্রথম এতটা বিস্তারিত পড়তে গিয়ে জানতে পারল, কীভাবে এরাজ্যে সাতের দশকে ছাত্র-যুবরা নকশাল নেতাদের একডাকে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। বহু মেধাবী এবং প্রতিভাবান যুবক ঘরে পর্যন্ত ফিরতে পারেননি। তাদের অনেকের মৃত্যু হয়েছিল পুলিশের গুলিতে। সেই আন্দোলন করে কার কী লাভ হয়েছিল, কেউ জানে না।

উৎসাহ থেকেই মাওবাদীদের সংবিধান সংক্রান্ত একটা বইও পড়ে ফেলল দ্রুত। সেখানে দেখল, মাওবাদীদের সংবিধানে যা বলা রয়েছে, তা আপাতভাবে সবার শুনতে ভালো লাগলেও কার্যক্ষেত্রে বাস্তবায়িত করা সম্ভব নয়। ওখানে বলা হয়েছে, কোথাও কেউ অসুস্থ হলে চিকিৎসককে রোগীর বাড়ি যেতে হবে। যা অবাস্তব একটা ধারণা ছাড়া আর কিছুই নয়। তবুও এটা একটা অদ্ভুত আদর্শ, যেখানে ঠিক ভুল বিচার করতে না পেরে জড়িয়ে পড়েন বহু সাধারণ মানুষ। গরীবরা এই দল করেন তবু তার একটা নির্দিষ্ট কারণ আছে, কিন্তু শহুরে কিছু লোক এই দলকে সমর্থন করা স্ট্যাটাস সিম্বল হিসেবে দেখেন। আখেরে তাতে লাভবান কেউ হন না। কী দল, কী সাধারণ মানুষ।

যদিও এসব আবার কে কবে বুঝল? নিজের কেনা বই পড়েই অরিন্দম জানতে পারল, পুলিশ মানেই আসলে মাওবাদীদের কাছে শ্রেণিশত্রু। ছত্তিশগড় এবং ঝাড়খন্ডে প্রতিবছর শ'খানেক পুলিশ কর্মী এবং নিরাপত্তারক্ষীকে মাওবাদীদের নাশকতার শিকার হতে হয়। দিন কয়েক তা নিয়ে আলোচনা হয়, তারপর নিজে থেকে থেমেও যায়। বইগুলোতে দেওয়া ছিল, কীভাবে মাওবাদীরা নতুন নতুন উপায়ে বুবি ট্র্যাপ (ফাঁদ) পাতে। গভীর জঙ্গলে জওয়ানরা তল্লাশি চালাতে গেলে সেই ফাঁদে পা দিয়ে প্রাণ যায় তাঁদের, এসংক্রান্ত নানা তথ্যও।

দু'দিন এভাবেই কেটে গেল। তৃতীয় দিন ডাক পড়ল বসের ঘরে। রাকেশ নিজে কী ভাবছেন, তা ব্যাখ্যা করলেন। অরিন্দম কীভাবে কাজ শুরু করতে চায়, সেটাও জানাতে বললেন। একটু টাইম চেয়ে বাড়িতে ফিরে একটা ছোট নোট তৈরি করল সে। তারপর বসকে জানাল, নিজের পরিকল্পনার কথা। এভাবেই টানা কয়েকদিন চলল আলোচনা। একদিন বৈঠকের মাঝে পরিস্থিতি খানিকটা হালকা করতে বস তাকে একটা হিন্দি সিনেমা দেখার কথা বললেন। পরিচালক প্রকাশ ঝাঁর সিনেমা 'চক্রব্যূহ'। ঘরে ডিভিডিতে দেখে খারাপ লাগল না, তবে মাথাতেও ঠিক ঢুকল না, এরকমও হয় নাকি? একজনকে পাঠানো হল মাও অধ্যুষিত এলাকায় অপারেশনে, সেই কি না মাওবাদীদের লোক হয়ে গেল? নানা কথার মাঝে একদিন সরল মনে এই প্রশ্নটা করেও ফেলল বসকে। তিনি উত্তর

দিলেন, ‘ঠিক কিংবা ভুল, এটা সিনেমা দেখে বিচার করতে যেও না। ওখানে যে সমস্যাগুলি রয়েছে, তা তুমি হলে কেমন করে সামলাতে, সেটা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করো।’ রাকেশ নিজেও কিছু বই এবং নথি দিলেন তাকে। পড়ে দেখার জন্য।

আরও অলস চারদিন কাটল। আবার একদিন ডাকলেন বস। তারপর খানিকটা গম্ভীর হয়ে বলা শুরু করলেন, ‘তোমাকে আরও একজন পার্টনার সঙ্গে দেওয়া হবে। তবে মনিটরিং সেলে আসল কাজটা করতে হবে তোমাকেই। আমরা একটা প্রাথমিক প্ল্যান তৈরি করেছি। এর ওপর কাজ করতে থাকো। তারপর টাইম টু টাইম স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী দায়িত্ব বদলে দেওয়া হবে। আমরা মেইন টার্গেট করছি মাওবাদী নেতা কিষেণজিকে। তারপর বিকাশ। শেষে জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো। স্পেশাল ব্রাঞ্চের রিপোর্ট বলছে, ছত্রধর প্রথম দু’জনের কথা মেনে চলে। সেই অনুযায়ী ওদের আন্দোলন চালিত হচ্ছে। ফলে এদের ওপর ক্লোজ ওয়াচ রাখতে হবে।’ কথা চলার মাঝেই ধীরে ধীরে ঘরে এসে ঢুকলেন ওসি এসটিএফ বিশ্বাসবাবু-সহ আরও দু’একজন। অরিন্দম শুনেছিল, বস সেদিন মহাকরণে গিয়েছিলেন। দীর্ঘ সময় জঙ্গলমহল নিয়ে সরকারি স্তরে ফের একদফা আলোচনা হয়েছে। তাই বসের জরুরি তলবে বুঝতে পেরেছিল আজ কিছু একটা সিদ্ধান্ত হয়ত হবে।

শুরু হল যুগ্ম কমিশনারের ঘরে বৈঠক। উপস্থিত দু’জনের কাছেও জানতে চাওয়া হল তাদের বক্তব্য। অরিন্দম ছোট্ট বক্তব্যে বলল, ‘আমি গত কয়েকদিন ধরে হোমওয়ার্ক করে একটা প্ল্যান তৈরি করেছি। আপনাদের অনুমতি পেলে ল্যাপটপে পুরোটা দেখাতে পারি।’ অনুমতি পাওয়া গেল। পরবর্তী দশ মিনিট ধরে চলল পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন। যখন শেষ হল, রাকেশের মুখ দেখে বোঝা গেল, তাঁকে অন্তত সন্তুষ্ট করা গিয়েছে। দীর্ঘ সময় ধরে চলল সেদিনের কথাবার্তা। তাকে কী কী করতে হবে, তা বিস্তারিত বুঝিয়ে দিলেন এসটিএফের শীর্ষকর্তা। সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতা। কাজ করতে গিয়ে কিছু মনে হলে সরাসরি তাঁর কাছে রিপোর্ট করার অনুমতি। বৈঠকে উপস্থিত ওসি এসটিএফ বুঝে গেলেন আগামী অন্তত কয়েকমাস তাঁদের অন্য কোনও অপারেশনে অরিন্দমকে পাওয়া যাবে না।

দুপুর থেকে সন্ধ্যা—দীর্ঘ আলোচনার পর, শেষ পর্যন্ত বস এই মিশনের একটা নাম দিলেন। আর নামটা হল,‘অপারেশন-কওন বনেগা কড়োরপতি’। সেটা পোশাকি, এর পিছনে লুকিয়ে থাকা আসল নাম হলো, কে ফর কিষেণজি, বি ফর বিকাশ এবং সি ফর ছত্রধর। সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, এদের যত দ্রুত সম্ভব জালে তুলে ফেলতে হবে। তবে, তাতে রক্তক্ষয় না হওয়াই শ্রেয়। আর যদিও বা সংঘর্ষের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে পুলিশের দিকে যেন কোনও ক্ষয়ক্ষতি না হয়। অর্থাৎ অপারেশনটা অত্যন্ত গোপনে এবং ধূর্ততার সঙ্গে শেষ করতে হবে। তাই এই অপারেশনে যাঁরা অংশ নিচ্ছেন তাঁদের কাছে কোড নেম হিসেবে থাকবে ‘কে বি সি।’ আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করে দিলেন রাকেশ নিজেই। আর সেটা হল, এই পুরো মিশনে পাল্টে যাবে অরিন্দমের নাম। আজ থেকে তার নতুন পরিচয়, অনির্বাণ রায়।

পুরো পরিকল্পনা পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে বুঝিয়ে দেওয়া হলো অনির্বাণ (অরিন্দম) এবং ওসি বিশ্বাসবাবুকে। আগে থেকে বসের মাথায় পুরো বিষয়টি থাকলেও এবার তা চূড়ান্ত রূপ পেল। তবে কাজ শুরু করার আগে আরও যে হোমওয়ার্ক প্রয়োজন, সেটাও বুঝে গেল অনির্বাণ। সঙ্গে সঙ্গে এটাও মাথাতে খেলে গেল, এতজনের মধ্যে থেকে তাকে এই কাজের জন্য যখন বাছা হয়েছে, তখন নিজের চেষ্টায় কোনও ত্রুটি রাখা চলবে না। বস বলেই দিয়েছেন, কাজটা সফল ভাবে করতে পারলে পুলিশের সাফল্যর ইতিহাসে চিরস্থায়ী ভাবে থেকে যাবে এই মিশন। অন্য দিকে মন বলছিল, সত্যি যদি কাজটা করেই ফেলা যায়, সেই দিন থেকেই নিজেদের ফোর্সে তার শত্রুর সংখ্যা একধাক্কায় আরও অন্তত শ'খানেক বেড়ে যাবে। তা বাড়ুক। আপাতত বসের সঙ্গে কথা বলে যে অক্সিজেনটা পেয়ে গিয়েছে, সেটাই অনেকটা চাঙ্গা করে দিয়েছে তাকে। এবার কাজে ঝাঁপিয়ে পড়তে আর কোনও দ্বিধা নেই। তাছাড়া এ ধরনের চ্যালেঞ্জিং কাজ অনির্বাণের বরাবর পছন্দের। সেজন্য সাংবাদিকতা ছেড়ে চলে এসেছিল এই কাজে। এখন কম বয়স, সাহসও বেশি, তাই রক্ত গরম থাকতে থাকতেই এসব কাজ করার ঝুঁকি নিতে হবে। সফল হলে স্মৃতি রোমন্থনের জন্য সারা জীবন তো পড়েই রয়েছে। সাংবাদিকতায় নতুন যোগ দেওয়ার পর এক সিনিয়র তাকে একবার বলেছিলেন, 'এই পেশায় প্রথম একবছর চূড়ান্ত পরিশ্রম করতে হবে। তারপর থেকে দেখবে ডিভিডেন্ড পাওয়া যাচ্ছে। অর্থাৎ সোর্সেরা বিশ্বাস করে খবর দিচ্ছে তোমায়।' পুলিশের চাকরি আবার ঠিক তেমন নয়। এখানে যত অভিজ্ঞতা বাড়বে, তত বেশি ধারাল হয়ে উঠবে একজন তদন্তকারী।

ঘোরাঘুরির সূত্রে আগেও দু'একবার জঙ্গলমহল গিয়েছে অনির্বাণ। ফলে ওখানে যাওয়ার সুবাদে এলাকার ভুগোল, ইতিহাস তার হাতের তালুতে। তবে একটা জায়গা ঘোরা বা সেখানে কঠিন পরিস্থিতিতে কাজে যাওয়ার মধ্যে বিস্তর ফারাক রয়েছে। এটা অনেকটা যেন সাংবাদিকতা এবং পুলিশের চাকরিতে থাকা পার্থক্যর মতো। অফিসের দেওয়া এই নতুন অ্যাসাইনমেন্ট তার মন্দ লাগল না। তাছাড়া প্রথম চাকরিতে ঢুকেই এই ধরনের একটা চ্যালেঞ্জ আড্রেনালিন গ্রন্থিকেও উত্তেজিত করে তোলার জন্য যথেষ্ট। সেই মুহূর্তের ভরপুর আত্মবিশ্বাস ভেতর থেকে যেন বার্তা পাঠাচ্ছিল, রাজ্যের শীর্ষ পর্যায়ের প্রশাসনিক কর্তাদের নজরে পড়ার এর চেয়ে ভালো সুযোগ আর আসতে পারে না।

এবার শুরু হল কঠিন পরিস্থিতিতে নিজেকে আরও ধারাল করে তোলার কাজ। তবে এই ধরনের অ্যাসাইনমেন্ট করতে গেলে বড় কর্তারা যেভাবে ছক করে দেন সেটা ফলো করতে পারলে সমস্যা হওয়ার কথা নয়। শুধু মাথাটা ঠিক রাখতে পারাটাই আসল। এখানে প্ল্যান এ আছে। এমন কী প্ল্যান বি-ও রাখা থাকে। ফলে নতুন কোনও চ্যালেঞ্জ সামনে এসে গেলে তা সামাল দেওয়ার মতো বুদ্ধিটাও শাণ দিয়ে রাখতে হয়। প্রয়োজনে পরিস্থিতি অনুযায়ী যাতে সেখান থেকে নিজেকে সুস্থ অবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়।

একটা বিরাট সুবিধা অবশ্য এই মিশনের ক্ষেত্রে পাওয়া গিয়েছে। বস অপারেশনের জন্য কোনও নির্দিষ্ট সময় বা তারিখ ঠিক করে দেননি। বরং ভরসা জুগিয়ে বলেছেন, 'টেক ইয়োর টাইম।' অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাদের, যারা এই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছেন। অনির্বাণরাই নিজেদের

সুযোগ এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী অপারেশনের সময় ঠিক করে নিতে পারবে। সবচেয়ে বড় বিষয় হল, বস খোলাখুলি জানিয়ে দিয়েছেন, 'ইটস ইয়োর বেবি।' কোনও জটিল এবং টাফ কাজ হলে রাকেশ এই বাক্যটা খুব বেশি ব্যবহার করেন। ফলে অনির্বাণের মতো একজন গ্রাম্য ছেলেকে যে একটা কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি ফেলে দেওয়া হয়েছে সেটা বুঝতে কোনও রকেট সায়েন্স বোঝার প্রয়োজন পড়ল না।

মুসকিল হল জীবনের কিছু বিষয় সবার সঙ্গে শেয়ার করা যায় না। এমনকী প্রেমিকার সঙ্গেও নয়। পাছে সেও উত্তেজনায় অন্য কাউকে শেয়ার করে বসে। প্রায় মন্ত্রগুপ্তি পাঠের মতো রাকেশও তাদের দিয়ে এটা বলিয়ে নিতে পেরেছেন এই মিশনের একটা অক্ষরও যাতে বাইরে না যায়। সারাদিন কাজ শেষে প্রায় রোজই ঘরে ফিরে তাই অনির্বাণের মনে হত, গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ থেকে তাকে যেন সরাসরি তুলে দেওয়া হয়েছে কলকাতার গিরিশ মঞ্চে। যেখানে পারফর্ম করতে পারলে আসল স্বীকৃতি পাওয়া সম্ভব। কাজ করতে করতে একদিন নিজের সহকর্মীদের আলোচনা লুকিয়ে শুনে নিয়েছিল সে। 'আসলে কী জানিস, ওকে স্যার রঞ্জি ট্রফি না খেলিয়ে সরাসরি ঢুকিয়ে দিয়েছেন টেস্ট টিমে।' বিভিন্ন জায়গা থেকে কূটকচালি শুনতে শুনতে এমনিতেই ক্লান্ত। তাই একই কথা বারবার শুনে নিজেকে টায়ার্ড করে তুলতে ইচ্ছে করছিল না। নিজে থেকেই সরে পড়েছিল সেখান থেকে।

যে কোনও নবাগত ক্রিকেটারকে কঠিন ম্যাচে প্রথমে একটু নীচের দিকে খেলানো হয়। সেই দস্তুর মানলে অনির্বাণের ক্ষেত্রে ওয়ান ডাউন-টু ডাউন হলে তাও কথা ছিল। সে সবের তোয়াক্কা না করে একেবারে ওপেনার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাঁকে। সফল হলে আর ভাবতে হবে না, কিন্তু যদি ব্যর্থতা আসে?

এক বছরের বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা করার ফলে এই সার্কিটে নিত্যদিন ব্যবহার করা বিভিন্ন শব্দ এবং আদবকায়দা জানা ছিলই। তাছাড়া তিনদিন ধরে চলা ওয়ার্কশপে লালবাজারের কনফারেন্স রুমে বসে রাকেশ সব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জানতে চেয়েছিলেন অনির্বাণের কাছে। শুধু মুখের বলাতেই কাজ হয়নি, ব্ল্যাক বোর্ডের সামনে দাঁড়িয়ে নিজে বোঝানোর পাশাপাশি তাকে বিভিন্ন ঘটনা অভিনয় করেও দেখাতে হয়েছিল বড় কর্তাদের সামনে। কীভাবে একজন অডিওভিস্যুয়াল জার্নালিস্ট কাজ করেন, তা আগাগোড়া পর্যবেক্ষণ করেছিলেন তাঁরা। আসলে, পুলিশের চাকরিতে যোগ দেওয়ার আগে অনির্বাণ যে সাংবাদিক ছিলেন তা লালবাজারের কর্তারাও আগে জানতেন না। ভালো হোক বা দুর্ভাগ্য, একদিন এসটিএফের জাল নোট বাজেয়াপ্ত করা নিয়ে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে অনির্বাণের আসল পরিচয় প্রকাশ্যে এসে পড়ে। তার পুরনো চ্যানেলের এক রিপোর্টার হাজির ছিল সাংবাদিক বৈঠকে। বসের সামনেই সেই সাংবাদিক প্রশ্ন করে বসে, 'কিরে সাংবাদিকতা ছেড়ে পুলিশগিরিতে কেমন লাগছে?' সে ইতিবাচক উত্তরই দিয়েছিল। সামনে কিছু না বললেও বিষয়টি নজর এড়ায়নি দুঁদে পুলিশ কর্তা রাকেশের। পরে একসময় বস ডেকে পাঠিয়ে পুরোটা শোনেন তার কাছ থেকে।

নিজের ব্যথা আর অপমানের বিস্তারিত বর্ণনার পাশাপাশি লড়াই করে এই চাকরি পাওয়ার ঘটনাটার পুরোটাই শুনিয়েছিল বসের সামনে বসে। সেদিন কথা বলতে বলতে চোখ দিয়ে জল

বেরিয়ে এসেছিল তার। উল্টোদিকে বসা জুনিয়রকে ওভাবে ভেঙে পড়তে দেখে রাকেশ পরামর্শ দিয়েছিলেন, 'তুমি যে চাকরিটা এখন করতে এসেছ আসলে সেটাও থ্যাংক লেস জব। প্রচুর সমালোচনা সহ্য করতে হবে। তাই কোনও আবেগ রাখা চলবে না। শুধু মনে রাখবে আমরা সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি। এটাই আমাদের একমাত্র মিশন।'

আজ একা একা ভাবতে বসে তার মনে হচ্ছে, সাংবাদিকতা করেছিল বলেই সম্ভবত এত জনকে ছেড়ে তাকে এই কাজের জন্য বাছা হয়েছে, এটাও কম পাওনা নয়। কারণ, কলকাতা পুলিশের এই বিশেষ ফোর্সে দক্ষ অফিসারের কমতি নেই। অনেকেই এরকম কাজ করার জন্য মুখিয়ে থাকে। তবুও অপারেশন কে বি সি-র জন্য তার ওপর কঠিন দায়িত্ব দিয়েছেন বড় কর্তারা।

কোনও কাজে আত্মবিশ্বাস যেমন ভালো, ঠিক তেমন অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস পতন ডেকে আনার জন্য যথেষ্ট। এটাও খুব ভালো করে জানা অনির্বাণের। তার এই দ্রুত সাফল্যর জন্য এত কম সময়ের মধ্যে শত্রুর সংখ্যা বেড়েছে বই কমেনি। সে নিজেও বোঝে একটা জীবনে প্রতিটা ম্যারাথন সবাই দৌড় শুরু করে জেতার জন্য। হারতে কেউ চায় না। তবুও হেরে গেলে চেষ্টা তো করতে হয় বারবার। যাতে সাফল্যটা অর্জন করা যায়।

লালবাজারে পর পর তিনদিন ক্লাস নিয়ে, বলতে গেলে, নতুন ভাবে গড়ে তোলা হল তাকে। বড় কর্তাদের সামনে রীতিমতো পিডি-১৭৫ ক্যামেরা চালিয়ে প্রশিক্ষণ হল অনির্বাণের। কীভাবে কপি লিখতে হবে, সেটাও হাতেকলমে শিখল কলকাতা পুলিশের এই সার্জেন্ট। অডিওভিস্যুয়ালের রিপোর্টারদের সাধারণ ভাবে কপি না লিখলেও চলে। সাংবাদিকতা করার সময় এই বিষয়ে দক্ষতা অর্জন না করলেও পুলিশের চাকরি করতে এসে সেই কাজটাই শিখতে হল এবার। প্রতিদিনই ওয়ার্কশপ চলার ফাঁকে ফাঁকে অপারেশনের জন্য তাকে বেশ কিছু কোড ওয়ার্ড ঠিক করে দেওয়া হল। যেমন, বসকে ডাকতে হবে বাবা নামে। কিষেণজির নাম হবে বড়, বিকাশের মেজো এবং ছত্রধরের ছোট। তো বাবার দেওয়া প্রথম অ্যাসাইনমেন্টটাই হল সে সময় জঙ্গলমহলে কাজ করা সব মাধ্যমের সাংবাদিকদের একটা তালিকা তৈরি করে এসটিএফের ওসির হাতে তুলে দেওয়া। মাত্র তিনদিন লাগল এই কাজটি সম্পূর্ণ করতে। সঙ্গে ওই প্রতিনিধিদের পূর্ণাঙ্গ বায়োডাটা। এমনকী সেসময় ওখানকার জেলা সংবাদদাতা যারা, তাদেরও ঠিকুজি কুষ্ঠি জোগাড় করতে বেশি সময় লাগল না। অনির্বাণরা রিসার্চ করে দেখল এদের মধ্যে আনন্দ চ্যানেলের সাংবাদিক দীপ কলকাতার বাসিন্দা হলেও দিনের পর দিন ঝাড়গ্রাম গিয়ে থাকছিলেন। এবং কোনও কারণ ছাড়াই।

প্রথম নজর রাখা শুরু হলো তাঁর উপরে। একজন সাংবাদিক কোনও ঘটনা ঘটলে তবেই ওই এলাকায় যাবেন, এটাই দস্তুর। কিন্তু সাংবাদিক দীপ মাসের পর মাস ওখানে গিয়ে পড়ে থাকছিলেন। আসল কারণ খোঁজার জন্য শুরু হল তাঁর মোবাইল ফোনে নজরদারি। দু'একদিনের মধ্যেই বোঝা গেল নিজের কাজটা ভালো ভাবে করতে পারেন বলে অফিসের কর্তারা ওকে খুব একটা পছন্দ করেন না। তাছাড়া দীপের সরাসরি এবং স্পষ্ট কথা বলাটাও অনেকের না-পসন্দ। মাওবাদী নেতা কিষেণজি ছাড়াও জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতোর বেশ ঘনিষ্ঠ ওই সাংবাদিক। প্রায়

রোজ তাদের মধ্যে কথাবার্তা হয়। আড়ি পেতে অনির্বাণ জানতে পারল ভদ্রলোক ভীষণ রকমের পেশাদার। ফোনে এমন কোনও আলোচনা করেন না যাতে বিশেষ কিছু লাভ হয়। তবু বড়ো কর্তাদের নির্দেশ এল, হাল ছাড়লে চলবে না। এই নম্বরে নজরদারি চলবেই। সি ডি আর ঘেঁটে এস টি এফের গোয়েন্দারা জানতে পারলেন ওই সাংবাদিকের লালগড় কভার করতে যাওয়াটাও অদ্ভুত ভাবে। ফোনে কোনও এক বন্ধুকে একদিন পুরো বিষয়টি জানাচ্ছিলেন তিনি। ঘটনা হল, ঠিক আগের বছর ২০০৮-এর ১২ নভেম্বর সাপ্তাহিক ছুটির দিন ছিল তাঁর। সন্ধ্যার দিকে বাজারে গিয়েছিলেন কিছু একটা কিনতে। লালগড় আন্দোলন তখন সবে শুরু হয়েছে। ওই চ্যানেলের এক সাংবাদিক তার দু'দিন আগে গিয়েছিলেন লালগড়ে। বিকেলের দিকে সেই সিনিয়র সাংবাদিক জানিয়ে দেন শরীর খারাপ হয়েছে, তাই তিনি ফিরে আসতে চান।

অফিস থেকে বস প্রমিতের ফোন পেয়ে মাঝরাতে দীপকে রওনা দিতে হয়েছিল ঝাড়গ্রামের দিকে। ততক্ষণে রাস্তা কাটাও শুরু হয়ে গিয়েছে। ফলে প্রায় কুড়ি কিলোমিটার ঘুরপথে ভোরবেলা গিয়ে পৌছেছিলেন তিনি। সেই রাতেই ঘটেছিল ওই ঘটনাটা। মাওবাদীরা দীপের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের বিবৃতি। যেখানে প্রথমবারের জন্য তারা জানিয়েছিল লালগড়ের আন্দোলনে কীভাবে যুক্ত রয়েছে ওই দল। এই খবর রাত ন'টা নাগাদ আনন্দ চ্যানেলে দেখানো হতেই গোয়েন্দারা অনেকটা নিশ্চিত হয়ে যান। তার আগে পর্যন্ত মিডিয়ার একটা অংশ এই আন্দোলনকে স্বতঃস্ফূর্ত গণ আন্দোলন বলে চালানোর চেষ্টা করছিল।

এসটিএফের মতো রাজ্যের বিভিন্ন এজেন্সির গোয়েন্দাদের মধ্যে অনেকেই তখন নকশালদের নিয়ে রীতিমতো গবেষণা করছেন। এরই মধ্যে মনিটরিং সেলের গোয়েন্দারা প্রস্তাব দিলেন, টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক দীপের পূর্ব ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। কারণ, যেভাবে আন্দোলনের প্রভাব কলকাতাতেও এসে পড়েছিল তাতে কোনও সম্ভাবনাই উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছিল না। এবার শুরু হলো সেই তথ্যতালাশও।

এর জন্য খুব একটা পরিশ্রম করতে হল না। ওই সাংবাদিকের ফোন ট্যাপ করে জানা গেল তাঁর আসল বাড়ি শিলিগুড়িতে। সেখান থেকেই তিনি স্কুল এবং কলেজের পড়াশুনো করেছেন। দীপের বাড়ি থেকে প্রয়াত নকশাল নেতা চারু মজুমদারের বাড়ির দূরত্ব আবার এক কিলোমিটারেরও কম। খতিয়ে দেখা হল সেই টিভি চ্যানেলের সাংবাদিকের ব্যাকগ্রাউন্ড। রাজ্য গোয়েন্দা পুলিশ দীপকে নিয়ে রিপোর্ট একটা তৈরি করল বটে, তবে তাতে উল্লেখযোগ্য কিছু পাওয়া গেল না। ফলে তার কথাবার্তা বা কাজকর্ম সম্পর্কে ফাইল তৈরি হলেও তা খুব একটা কাজে দিল না।

দীর্ঘদিন ধরে জঙ্গলমহল কভার করার জন্য দীপের সঙ্গে ততদিনে কিষেণজি এবং ছত্রধরের বেশ ঘনিষ্ঠতা গড়ে উঠেছিল। তাদের মধ্যে খবরাখবর আদানপ্রদানের পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের বিষয় নিয়ে আলোচনা হত। স্বাভাবিক ভাবেই সেগুলি শোনা যেত রেকর্ডিং থেকে। ফলে বহু ক্ষেত্রে অনেক সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধির ফোনে কান পেতে আন্দোলনের খবরাখবর পেয়ে যেতেন গোয়েন্দারা। বিশেষ করে কিষেণজির খবর। ততদিনে সামনাসামনি দেখা না গেলেও এরাজ্যে মাওবাদীদের

প্রচারের প্রধান মুখ হয়ে উঠেছিলেন তিনি নিজেই। একটা লোক সারাদিন ধরে সংবাদমাধ্যমের জন্য এতটা সময় বরাদ্দ করতে পারেন, তা কিষেণজিকে না দেখলে বোঝা যেত না। পুলিশ কর্মীরা নিজেদের মধ্যেই আলোচনা করতেন, লোকটা পারেন বটে সারাদিন ধরে বকবক করতে!

লালবাজারে অপারেশনের বিষয়টি চূড়ান্ত ভাবে ব্রিফ করার সময় অনির্বাণদের পরিষ্কার করে দেওয়া হয়েছিল, শুরুতে কী কী কাজ করতে হবে। প্রথম দিনেই অনির্বাণদের একটা বড়ো আকারের ফর্দ ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। সেটায় চোখ বোলাতে গিয়ে অবাক হয়ে গিয়েছিল সে। ওখানে পরপর প্রায় কুড়ি জন কাগজ এবং টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধির নাম লেখা রয়েছে। নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল, শুধু ফোন ট্যাপ করেই থামলে চলবে না, এদের স্যাডো করতে হবে, অর্থাৎ লুকিয়ে ছায়ার মতো অনুসরণ চালাতে হবে। ওই তালিকায় এমন কিছু নাম ছিল, যাদের মধ্যে জনা পাঁচেকের ফোন আগে থেকেই নজরদারিতে রয়েছে। এবং দীর্ঘদিন ধরে সেই নজরদারি চলায় ওই সাংবাদিকদের সম্পর্কে অনেককিছুই জানা হয়ে গিয়েছে গোয়েন্দাদের। কিন্তু বাকিরা? সেই কাজটাও করতে হচ্ছিল এবার।

আপাত দৃষ্টিতে ফোনে নজরদারির কাজটা খুবই সহজ, কিন্তু একটা সমস্যা ছিলই। যেমন, এরা সবাই একই জায়গায় থাকেন না। কলকাতাতে কেউ কাজ করেন তো কেউ পশ্চিম মেদিনীপুরে। তার মানে, দুটি দলে ভাগ হয়ে কাজটা করা দরকার। অনির্বাণকে আগেই বলে দেওয়া হয়েছিল শুধু এদের ফোন নম্বর নজরদারিতে রাখলেই চলবে না। তারা কী করেন, কার কার সঙ্গে দেখা করেন সব জানতে হবে একইসঙ্গে। আসলে এই কাজটার ওপরেই নির্ভর করছিল মূল অপারেশন কোন গতিমুখ ধরে এগোবে তা। টানা তিনদিন তিনবেলা কানে হেয়ার ফোন দিয়ে সাংবাদিকদের কথোপকথন শুনে মনে হল, বাপরে! এরা কথা বলে কী করে। প্রতি দু'টো সেন্টেন্স পিছু একটা করে স্ল্যাং। অথচ, বাইরে থেকে একএকজন কে দেখে কিছু বোঝার জো নেই। বেশিক্ষণ ধরে এক একটা কলে কান পাতা দায়। তবু কিছু করার নেই। আপাতত এই কাজটাই করতে হবে মন দিয়ে। এমনই নির্দেশ। মোটামুটি সকাল সাতটা থেকে শুরু হত আড়িপাতা। কারণ, অধিকাংশ মাওবাদী নেতা কার্যকলাপ শুরু করে দিতেন ভোর ভোর। কম বেশি সব সাংবাদিক আবার দেরি করে ঘুম থেকে ওঠেন। ফলে দু'টো মিলিয়ে তাল ঠিক রাখাই কষ্টকর হয়ে উঠছিল।



আন্দোলন শুরুর সময় থেকে জঙ্গলমহল এলাকার বাসিন্দাদের কাজকর্ম কার্যত বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দুপুরবেলা ঢাকঢোল পিটিয়ে তাদের মিছিলে অংশ নিতে বাধ্য করা হত। সকালবেলাতেই নেতারা নিচুতলার কর্মীদের কাছে বার্তা পাঠিয়ে দিতেন সেদিন ঠিক কীভাবে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে তার বিস্তারিত। প্রতিদিন আন্দোলনের আগাম খবর দিয়ে দেওয়া হত সাংবাদিকদেরও। যাতে তারা কভার করার জন্য ঘটনাস্থলে সঠিক সময়ে পৌছে যেতে পারেন। সে এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা অনির্বাণের। কার বাড়িতে কী সমস্যা, কোন সাংবাদিকের কার সঙ্গে কী সম্পর্ক, সবই জানা যাচ্ছিল তাদের করা ফোন কল থেকে। এছাড়া আরও এমন কিছু ব্যক্তিগত তথ্য পাওয়া যাচ্ছিল রোজ যা বেশ চমকপ্রদ।

প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ২৪X৭ চলল এই কাজ। প্রতিদিন পুরোটা শোনাই শুধু নয়। প্রত্যেকের জন্য বানানো আলাদা আলাদা ফাইলে সব লিপিবদ্ধ করতেও হত। সেজন্য ফোনে কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে নোট নিয়ে নিত তাঁরা। নিজেদের কাজে লাগতে পারে এমন তথ্য লিখে রেখে বাকি সব মুছে ফেলা হত রোজ। একসপ্তাহ কেটে যাওয়ার পর বসের কাছে নিয়ে যাওয়া হল সেই রিপোর্ট। তাতে চোখ বুলিয়েই মুচকি হাসি দেখা গেল বসের মুখে। তবে প্রথম কয়েকদিনের ধকলের পর চাপ অনেকটা কমে গেল। নজরদারির সংখ্যাটাও অনেকটাই কমিয়ে আনা হল একধাক্কায়। ওই তালিকা থেকে বস চিহ্নিত করে দিলেন মাত্র কয়েকজনের নাম। টিক দিয়ে দেওয়া হলো সেই সব নামের পাশে। এই বিশেষ ব্যক্তিদের এবার থেকে আরও কাছাকাছি থেকে অনুসরণ করতে হবে। মানে, সোজা বাংলায় বললে টিকটিকি গিরি করতে হবে এদের প্রতি পদক্ষেপে।

এবারের কাজটা অবশ্য এসটিএফের পক্ষ থেকে ভাগ করে দেওয়া হল দু'জনের মধ্যে। ততদিনে অনেকটা ঠিকই হয়ে গিয়েছিল কারা কারা মূল অপারেশনের সঙ্গে যুক্ত থাকবেন। বসের দেওয়া নির্দেশ অনুযায়ী দেখা গেল, প্রথমে যে ২০ জনের দিকে নজরটা ছিল তা পাঁচে নেমে এসেছে। শুধু নজরদারিতে কাজ হবে না, এটা বুঝতে পেরে নিজেদের মধ্যে একদফা আলোচনার পর ঠিক করা হল অনির্বাণকে এবার পাঠানো হবে পশ্চিম মেদিনীপুরে। কিন্তু বললেই তো আর হল না, তার আগে আটঘাট বেঁধে কাজে নামতে হবে। কারণ, সাংবাদিকরা ভয়ঙ্কর এক প্রজাতি। তারা নিজেদের ছায়াকেই বিশ্বাস করে না। ফলে এই কাজে তাকে কোনও না কোনও ছদ্মবেশ ধরে তবেই এগোতে হবে। হাজার ভাবনাতেও মাথায় আসছিল না ঠিক কী সাজলে সুবিধা হয়। এমন কিছু ভেক ধরলে চলবে না যাতে কোনও সময় তাঁদের কারো সন্দেহ উদ্রেক করে। আবার ধরা পড়লেই বা কী বলে রেহাই পাবে সেটাও পরিকল্পনার মধ্যে রাখতে হল।

একবার মনে হল, নিজেও যদি সাংবাদিক সেজে কাজ শুরু করা যায় তাহলে কেমন হয়। হয়তো করাও যেত, কিন্তু মন বলল অন্যকথা। কাজের সূত্রেই কেউ না কেউ একদিন প্রশ্ন করবে তার পরিচয় জানতে, তখন কী বলে বিষয়টা সামাল দেবে? মিথ্যা বললে ধরা পড়ে যাওয়ার সম্ভবনা প্রবল। এসব এলাকায় যে সব সাংবাদিকরা কাজ করছেন তারা একে অপরকে বেশ ভালো ভাবেই চেনেন। আর একবার তাদের সন্দেহের তালিকায় ঢুকে পড়লে আর রক্ষে নেই। আদাজল খেয়ে

অনির্বাণের পিছনে পড়ে যাবে সব সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি। এদের নিজেদের মধ্যে নানা বিষয় নিয়ে রাতদিন ভয়ঙ্কর রকমের ঝামেলা, কিন্তু এরকম ইস্যুতে তাদের মধ্যে আবার বিরাট মিল।

লালগড় আন্দোলন পর্বে একটা বিষয় পুলিশ কর্তাদের বারবার নজরে পড়ছিল। আর সেটা হল, মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামের সাংবাদিকদের আড়াআড়ি ভাগ হয়ে যাওয়া। দু'দিকের প্রতিনিধিরা একে অপরকে দেখতে পারতেন না। তাদের মধ্যে যেন একটা অঘোষিত শত্রুতা চলছিল। ফলে একে অন্যের সম্পর্কে অনেক খবর পুলিশ কে জানিয়ে দিত। কার সঙ্গে কার সুসম্পর্ক সেটাও বোঝা যেত সামান্য একটু চেষ্টা করলেই। সবচেয়ে বেশি প্রতিযোগিতা ছিল কিষেণজি ঠিক কোন দিকের ঘনিষ্ঠ তা নিয়ে। পুলিশের কাছে সংবাদ মাধ্যমের সেসব ছোটখাট সমস্যা খুবই কাজে লাগছিল। একে অন্যর সঙ্গে ঝামেলা করতে করতে ফোনে বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য নিয়ে আলোচনা করলেই মুহূর্তে তা জেনে নিতেন অন্যপ্রান্তে ওত পেতে থাকা পুলিশ কর্তারা। মোবাইল ফোনের ব্যবহার বেড়ে যাওয়ায় একটা আন্দোলন সম্পর্কে অনেক গোপন বিষয় অতি সহজে জেনে নিতে পারছিলেন গোয়েন্দারা।

কন্ট্রোল রুম থেকে টানা তিন সপ্তাহ ধরে নজরদারির পর দেখা গেল একটি বিশেষ নাম ভীষণ ভাবে কমন হয়ে উঠছে সব ক্ষেত্রে। প্রায় সবার মুখে বিভিন্ন আলোচনায় সামনে আসছে সেই নামটি। তা মাওবাদীদের হাঁড়ির খবর রাখাই হোক কিংবা সেই খবর সাংবাদিকদের দেওয়া এবং নিজের ঢাক নিজে পেটানো সবেতেই। ভদ্রলোক থাকেন ঝাড়গ্রাম শহরে। কাজ করেন একটি বাংলা নিউজ চ্যানেলে। খবর পাঠান একটি বাংলা দৈনিকেও। কাকতলীয় হলেও মিলে গেল যে ওই চ্যানেলে এক সময় সাংবাদিকতা করত অনির্বাণ নিজেও। কাজেই ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে খোঁজ খবর নিতে খুব একটা অসুবিধা হল না। নিজের লক্ষ্যটা নির্দিষ্ট হয়ে যেতে নজরদারিতে সুবিধা হল তার।

তবে শুধু ঝাড়গ্রামের এই বাসিন্দাই নন, বাকি প্রতিনিধিদের সম্পর্কেও এরই পাশাপাশি খোঁজ নেওয়ার কাজ চলছিল রোজ। তবে নজরে রাখা ওই সাংবাদিকের থেকে অন্যরা অনেকটাই আলাদা এই কারণে যে, তারা নিজেদের কাজটা বাগিয়ে নিতে বেশি আগ্রহী। কিন্তু এই সাংবাদিকের একটা বিশেষ গুণ, তিনি নিজে খবর করেন কম, খবর রাখেন বেশি, আবার অন্যদের দিয়ে করাতে চান আরও বেশি।

ভদ্রলোকের নাম বীক্ষণ রায়। টানা কয়েক দিন তার ফোন এবং অন্যান্য নানান যোগাযোগ থেকে জানা গেল এটা তার আরও একটা নাম। একসময় তিনি শাসকদলের পঞ্চায়েত সদস্য ছিলেন। বহিষ্কৃত হওয়ার পর নিজের নামটাই পাল্টে নেন। তারা টিভি চ্যানেল ছাড়াও একদিন নামে একটা বাংলা কাগজে বীক্ষণ কাজ করেন। মাওবাদীদের নিয়ে যা খবর পাঠান তার চেয়ে অনেক বেশি তথ্য তার কাছে থাকে। সাংবাদিকদের কাছে নিজের গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য প্রকাশ্যে নিজেকে কিষেণজির ঘনিষ্ঠ বলে দাবি করে থাকেন। সেই দাবির অবশ্য খানিকটা সত্যতা রয়েছে। মাওবাদীদের নানা সময়ের প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর কাছে প্রথম আসে। বীক্ষণ নিজেও চান লালগড় নিয়ে কেউ খবর করতে এলে যাতে তাঁর সঙ্গেই যোগাযোগ করেন। পুলিশ কর্তারা যদিও মনে করতেন এটাও একধরনের হতাশার বর্হিপ্রকাশ।

তাঁর সম্পর্কে মোটামুটি খোঁজখবর নেওয়া শেষ হতেই এবার শুরু হল ঝাড়গ্রামের সেই সাংবাদিকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা। যতটা কঠিন ভাবা হচ্ছিল দেখা গেল সেই কাজটাও কঠিন থাকল না। অনির্বাণ একরাতে ফোনে বীক্ষণকে বলল, 'আপনার নাম সব সাংবাদিকের কাছেই শুনতে পাই। কলকাতা শুধু নয়, দিল্লি, মুম্বইয়ের অনেকেই আপনার নাম জানেন। বাইরে থেকে জঙ্গলমহল কাজ করতে যাওয়া সবাইকেই আপনি সাহায্য করেন। কাল কলকাতা প্রেস ক্লাবে গিয়েও আপনার কথা অনেকের মুখে শুনলাম। সেখান থেকে নম্বরও পেলাম। তাই আজ ফোন করলাম। দু'একদিনের মধ্যে ঝাড়গ্রামে গিয়ে আপনার সঙ্গে সামনাসামনি দেখাও করতে চাই।'

এইটুকু টনিক যথেষ্ট ছিল তখনকার মতো। বীক্ষণ প্রায় গদ গদ হয়ে বললেন, 'অবশ্যই আসুন। আপনি ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সিতে কাজ করেন। ফলে আমার দ্বারা যতটুকু সাহায্য সম্ভব তা আমি করে দেব। রাস্তায় কোনও অসুবিধা হলে আমার নাম বলতে পারেন। কোনও সমস্যা হবে না।' প্রস্তাবটা খারাপ লাগল না অনির্বাণের। টানা বন্ধ আর হামলার মতো আন্দোলনের জেরে গোটা ঝাড়গ্রাম তখন উত্তাল। আর লালগড়ের কোর এলাকায় চলছে পুলিশ বয়কট। ফলে একজন পুলিশ কর্মীর পক্ষে সেখানে গিয়ে কাজ করা বেশ কঠিন।

অনির্বাণ এই ভূমিকায় নতুন হলেও ততদিনে স্থানীয় এবং বাইরের বেশ কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে কিষেণজি এবং বিকাশের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, এমনকী তাদের নিয়মিত কথাবার্তাও হত। এটাও ঠিক, বাইরে থেকে, মূলত বিবিসির মতো সংস্থার প্রতিনিধিরা ওই এলাকায় কাজ করতে গেলে বীক্ষণের দ্বারস্থ হতেন। সামান্য কিছু টাকা আর রাতে দু'পাত্তর পেলেই নাকি সব কিছুই উজাড় করে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্পণ্য ছিল না তাঁর। পুলিশ, ওই এলাকায় কী হচ্ছে তা জানার জন্য ঠিক এই রকম একজনের খোঁজে ছিল। ফলে দুইয়ে দুইয়ে চার করতে বিশেষ কষ্ট করতে হল না।

এই যোগাযোগের কথা বসকে জানানো হলো সঙ্গে সঙ্গে। তিনি অনির্বাণকে নিজের ঘরে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তুমি তোমার মতো টাইম নিয়ে কাজ করো। তাড়াহুড়ো করতে হবে না। তবে এই মিশনটা সম্পূর্ণ করতে হবে তোমাকেই। ইটস ইওর বেবি।' খানিকটা ভাবার জন্য সময় চেয়ে অনির্বাণ সোজা চলে গেল নিজের ঘরে। তারপর নিজের অবসরের সঙ্গী কিশোর কুমারের গান শুনতে শুনতে শুয়ে পড়ল একসময়।

বিশ্রাম, ঘুম সবই হলো, কিন্তু কী ভাবে কী করবে, তা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছিল না। গান শুনতে শুনতে খানিকটা সময় শুয়ে তারপর টেনশনে উঠে পড়ল একটা সময়। একা একা হাঁটতে হাঁটতে পৌঁছে গেল ভিক্টোরিয়ার সামনে। অনেকদিন পর ইচ্ছে হলো ফুচকা খেতে। গোটা দশেক ফুচকা খাওয়ায় পর দাম মিটিয়ে পকেটে হাত দিতেই মনে হল মোবাইলটা অনেকক্ষণ ধরে সাইলেন্ট মোডে দেওয়া রয়েছে।

ফোনটা হাতে নিতেই দেখা গেল শ্যামবাজার এলাকার এক সোর্স বেশ কয়েকবার ফোন করে ফেলেছে ইতিমধ্যে। রানা নামে এই ছেলেটি বেশ করিতকর্মা। কয়েকটা সলিড খবরও দিয়েছে।

সুতরাং ওকে ফোন ব্যাক করল অনির্বাণ। 'স্যার, বিনোদ আবার নতুন করে গ্যাং তৈরি করছে। কে কে আছে সব জোগাড় করে ফেলেছি। বলব এখন?' উৎসাহিত হয়ে জানতে চাইল সে।

অনির্বাণ জবাব দিল, 'ঠিক আছে বুঝলাম। আমি তোকে সময় মতো ফোন করে নেব। একটু অন্য কাজে ব্যস্ত আছি এখন।' 'আচ্ছা' বলে ফোন কেটে দিল রানা। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে অনির্বাণ ঠিক করল একবার নিজে জঙ্গলমহলে গিয়ে পুরো পরিস্থিতি দেখে এলে কেমন হয়। তাছাড়া ওকে তো কেউ চেনে না। এমনকী বীক্ষণও নয়। সুতরাং আর অপেক্ষা না করে লালবাজারে গিয়ে নিজের ভাবনাটা সরাসরি জানিয়ে দিল বসকে। সে নিজে কী প্ল্যান করেছে তার খানিকটা জানালো রাকেশকে। বস এক কথায় রাজি। শুধু বললেন, কোনও রকম প্রয়োজন হলে তাঁকে যেন সরাসরি জানানো হয়।

অনির্বাণের বহু পুরনো এক সোর্স থাকেন খড়গপুর। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করতেই তিনি আশ্বাস দিলেন ঝাড়গ্রাম পৌঁছনোর ব্যবস্থা করে দেবেন। যদিও তার কাছে অনির্বাণের ওখানে যাওয়ার আসল কারণ গোপন রাখা হল। হাওড়া থেকে যারা ঝাড়গ্রামের দিকে যান, সবাই জানেন স্টিল এক্সপ্রেসে চাপলে সরাসরি ঝাড়গ্রাম স্টেশনে রাত দশটার মধ্যে পৌছে যাওয়া যায়। কিন্তু প্রথমবার অত রাতে সেখানে যাওয়ার ঝুঁকি নিল না সে। বিশেষ করে বীক্ষণ যখন জেনে গিয়েছেন অনির্বাণ ওখানে যাচ্ছে।

ফোনে ফোনে কথা বলে আগে থেকে ঠিক করা ছিল সব কিছু। জুলাই মাসের ১ তারিখ। ২০০৯। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে খড়গপুর রওনা দিল অনির্বাণ। রাত আটটা নাগাদ ট্রেন নামিয়ে দিল স্টেশনে। এমনিতেই খড়গপুর স্টেশনটা বেশ বড়ো। বাইরে বেড়িয়ে দেখতে পেল একটা নতুন আই টেন গাড়ি পার্ক করা।

নম্বর মিলিয়ে এগিয়ে যেতেই নজরে এল গাড়ির পিছনের সিট ফাঁকা। সামনের সিটে বসে যিনি, তার ডান পা আবার ভাঙা। পায়ে প্লাস্টার করা। সেই সিটটা একটু পিছন দিকে টেনে সেই ভাঙা পা তুলে রাখা হয়েছে ড্যাশবোর্ডের ওপর। ফলে সামনে বা সাইড থেকে দেখলে মনে হবে গাড়ি আসলে ঝাড়গ্রামের দিকে যাচ্ছে আহত ভদ্রলোকের জন্যই। অনির্বাণের আসল উদ্দেশ্যও ছিল ঠিক তাই। যাতে বেশি রাতে রাস্তায় মাওবাদীরা গাড়ি থামিয়ে চেকিং করলেও বুঝতে না পারে ওর পরিচয়।

আগাম পরিকল্পনা অনুযায়ী, পা ভাঙা ভদ্রলোককে সামনে বসানো হয়েছিল আসলে এক ঢিলে দুই পাখি মারার জন্য। রোগী দেখানোর ছুতোয় মসৃণ ভাবে ঝাড়গ্রামে ঢুকে পড়াই ছিল আসল কাজ। তাহলে পা ভাঙা ভদ্রলোক কে? তিনিই তো অনির্বাণের সোর্স। খড়গপুর হয়ে বোম্বে রোড ধরে কলাবনি জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে তাদের আই টেন দ্রুত গতিতে ছুটে চলল। একঘণ্টার একটু বেশি সময়ে পৌঁছে গেল মহকুমা শহরটাতে। টানা আন্দোলন এবং বন্ধ এর দাপটে ছোট্ট জায়গাটা তখন যেন আতঙ্কনগরী। বিকেল থেকেই রাস্তাঘাট ফাঁকা, সবাই ঘরে ঢুকে খিল তুলে দিচ্ছেন হামলার অজানা আশঙ্কায়।

শহরের মধ্যেও দিনের বেলা দোকানপাটও বন্ধ, ভয়ে। কারণ, ততদিনে ঝাড়গ্রাম শহরে জনসাধারণের কমিটি দু'দুটি হামলার ঘটনা ঘটিয়েছে। যার মধ্যে একটি দহিজুড়িতে সিপিএম নেতা

অমিয় সেনগুপ্তের বাড়িতে। সেখানে ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে আসবাবপত্রে। অন্যটি, ঝাড়গ্রাম মিনি জু-তে। যেখানেও হামলা চালিয়ে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়। যার ফলে একাধিক বন্যপ্রাণী মারা যায় আগুনে ঝলসে গিয়ে। এসব ছিল শহরের মধ্যে, আর শহরের বাইরে বম্বে রোড দিয়ে যাতায়াত করা বিভিন্ন গাড়িতে আগুন ধরিয়ে রীতিমতো ত্রাস তৈরি করা হয়েছিল। প্রতিটি নাশকতার নেতৃত্বে ছিল জনসাধারণের কমিটি এবং মাওবাদীরা। আগুন লাগানোর আতঙ্কে এলাকার সব হোটেল এবং লজে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন মালিকপক্ষ। সোজা কথায়, তাদের ব্যবসা ততদিনে কার্যত লাটে উঠে গিয়েছিল।

প্রথমবার কাজে যাওয়া, তাও একটা গোপন মিশনে, ফলে বড় কোথাও না থেকে একটা ছোট্ট মতো হোটেল দেখে সেখানেই থাকার সিদ্ধান্ত নিল অনির্বাণ। এলাকায় কয়েকজনের কাছ থেকে খোঁজ নিয়ে জানতে পারল ভালো হোটেল বলতে একমাত্র অরন্য সুন্দরী লজ খোলা রয়েছে। তবে সেখানে সব সময়েই সাংবাদিকদের ভিড়। বিশেষ করে আনন্দ চ্যানেলের সাংবাদিক দীপ ওই লজ ছাড়া আর কোথাও থাকেন না। সেখানে গেলে পরিচয় জেনে যাওয়ার সুযোগ রয়েছে কাজেই প্রথমবারের জন্য ছোটখাট হোটেলই ভালো। নিজের নিরাপত্তার দিকটিও দেখা দরকার। এবার প্রথম বলে সার্ভিস রিভলবারটাও সঙ্গে আনেনি।

আর্মস না আনলেও ব্যাগে তার জায়গা নিয়েছে এসটিএফের পক্ষ থেকে বানিয়ে দেওয়া একটা প্রেস কার্ড এবং কয়েকশো ভিজিটিং কার্ড। অর্থাৎ নিজের কাছে পুলিশ হওয়ার কোনও নথি তার কাছে অন্তত নেই। শুধু থাকার মধ্যে আছে অফিসের দেওয়া মোবাইল ফোন এবং আরও প্রায় দশ বারোটি সিম কার্ড। প্রয়োজন মতো যখন খুশি যেটা দিয়ে ফোন করা যায়।

প্রথম রাতটা কাটল। পরদিন সাতসকালে উঠে চালককে নিয়ে সোর্স রওনা দিল ফের খড়গপুরের দিকে। অন্যদিকে, সে হোটেলের বয়দের থেকে জানার চেষ্টা করল এখানে রঘুনাথপুর বলে জায়গাটা কোথায়। তারাই জানাল, হোটেল থেকে বেরোলে শহরের পাঁচ মাথা মোড় থেকে ডানদিকে গেলে একটা এসটিডি বুথ রয়েছে ডিংডং। সেই দোকানের পাশ দিয়ে নাক বরাবর রাস্তাটাই পৌঁছে গিয়েছে রঘুনাথপুর।

সকাল সাতটা। তেমন ভালো পোশাক না পরে, একটা সাধারণ ট্র্যাকশুট আর টি শার্ট পরে হেঁটেই রওনা দিলো রঘুনাথপুরের দিকে। বাড়ি খুঁজে বার করতে অবশ্য বেশি পরিশ্রম করতে হল না। ভদ্রলোককে মোটামুটি এলাকায় সবাই চেনেন।

একতলা বাড়ি। সামনে এবং পাশে বেশ খানিকটা জায়গা রয়েছে। রয়েছে একটা বড় আমগাছ। কিন্তু প্রথম দিনেই নতুন সাংবাদিককে বাড়িতে এন্ট্রি দিলেন না বীক্ষণ। নিজে বেরিয়ে এলেন। তারপর হাঁটতে হাঁটতে নিয়ে গেলেন খানিকটা দূরের একটি টেলিফোন বুথে। বেশ ফাঁকা জায়গাটা। বোঝা গেল এটাই ওর ঠেক। বুথটার নাম সেই ডিংডং। প্রথম দর্শনে অবশ্য লোকটিকে দেখে বিশেষ সুবিধার বলে মনে হলো না তার। কালো করে রোগা মতো চেহারার ভদ্রলোক, একবার নিজের

সম্পর্কে বলতে শুরু করলে আর থামতেই চান না। কাকে কাকে, কীভাবে সাহায্য করেছেন তার তালিকা পড়তে শুরু করেন যেন।

জঙ্গলমহল নিয়ে এখনও পর্যন্ত যেখানে যা খবর প্রকাশিত হয়েছে বা হচ্ছে সবই তাঁর দেওয়া বলে দাবি করলেন প্রথম পরিচয় হওয়া আগন্তুকের সঙ্গে। এই ধরনের লোকদের নিয়ে মূলত দু'ধরনের সমস্যা হয়। এক, নিজের ঢাক পেটাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এমন কিছু কথা বেফাঁসে বলে বসেন যাতে ঝামেলা বেড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অন্য দিকে, তাঁর সঙ্গে কারা যোগাযোগ রাখেন সেটাও কথায় কথায় সামনে এনে ফেলেন। এই দুটির একটিও তার পক্ষে খেটে গেলে সেটা প্রবল চাপের। যদিও এসব ছোটোখাট বিষয়, কিন্তু ভদ্রলোককের বাড়ি যাওয়ার পর উনি এমন সব বিষয়ে জানতে চাইলেন যা তথ্য হিসেবে কাউকে জানাতে রাজি ছিল না অনির্বাণ।

তবে তাতে আর কী এল গেল, ঝাড়গ্রামের ওই বাসিন্দার? জঙ্গলমহল নিয়ে প্রায় কিছু না জানা সাংবাদিককে সামনে পেয়ে নানাবিধ পরামর্শ দেওয়ার সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইছিলেন না তিনি। জঙ্গলমহলে কীভাবে কাজ করতে হবে, তার ওপর একটা ছোটখাটো লেকচার পর্যন্ত দিয়ে ফেললেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে।

আলোচনা এখানেই শেষ হল না, কোন কোন সাংবাদিক ঠিক সুবিধের নয় সেই কথাটাও উঠে এল তাঁর কথায়। তাতেই বোঝা গেল আনন্দ চ্যানেলের সাংবাদিক দীপ, ওই চ্যানেলের স্থানীয় সাংবাদিক অজিতাভকে একদম পছন্দ করেন না বীক্ষণ। মুখে বললেন, 'এরা সব দু'দিনের ছোকরা, কিছু না জেনে চলে এসেছে মাওবাদী আন্দোলনের খবর করতে। ওই দলের কে ওদের চেনে বলুন তো। এই যে কিষেণজি রোজ রাতে আমার সঙ্গে কথা বলেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তা, আমি কি সেটা বাইরে ফাটাতে যাবো? কখনওই নয়। আমাকে তো বিশ্বাস করে অনেক গোপন কথাও বলে দেন, কিষেণজি জানেন আমি ওসব খবর বাইরে কাউকে বলব না।' এবার একটু দম নিলেন। তারপর জানতে চাইলেন, 'আপনি যেন কোথাকার? কী একটা নাম যেন বললেন?' অনির্বাণ হালকা করে বলল, 'আমি এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালের হয়ে কাজ করতে এসেছি। তবে কী জানেন, এখনো পার্মানেন্ট হইনি। স্টোরি পিছু টাকা পাই।'

—'ও, আচ্ছা, বুঝলাম।' হঠাৎ করে যেন মুখটা কেমন চেঞ্জ হয়ে গেল বীক্ষণের। 'বিবিসির সুমিতাভর নাম শুনেছেন, ওকে সব খবর তো আমি দেই। এরা সব কলকাতা থেকে আসে, অথচ কিচ্ছু জানে না। আমি না দিলে কোনও খবরই পায় না।'

কথা বলার ফাঁকে অবশ্য ক্রমাগত ফোন আসছিল বীক্ষণের মোবাইলে। অনির্বাণকে শুনিয়ে জোর গলায় নানান ভাষণ দিয়ে চলছিলেন ভদ্রলোক। সকাল থেকেই নাকি রয়টার্স, এ এফ পি সবাই মিলে ফোন করা শুরু করে তাঁকে। আর কাগজের সাংবাদিকদের তো কথাই নেই। যারা ফোন করছিলেন তাদের মধ্যে কেউ একজন কিষেণজির সঙ্গে কথা বলতে চান। তাই নম্বর চাইলেন বীক্ষণের কাছে। মোবাইলে বেশ জোরে জোরে নম্বারটা জানিয়ে দিলেন তিনি।

শুনেই বোঝা গেল এই নম্বরটা নতুন। সেটা জেনে নিতে বিন্দুমাত্র কষ্ট করতে হল না অনির্বাণকে। সম্ভবত এখন এটাই ব্যবহার করছেন ওই মাওবাদী নেতা। প্রায় প্রতি সপ্তাহেই কোনও না কোনও সিপিএম নেতাকে খুন করে মোবাইল ফোন কেড়ে নেয় মাওবাদীদের স্কোয়াড সদস্যরা। তারপর সেই নম্বরগুলি দিয়ে নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ রাখে তারা।

এরকমই কয়েকটি ফোন নিজের ব্যবহারের জন্য নিয়ে নেন কিষেণজি। সপ্তাহ খানেক ব্যবহার করার পর সেই ফোনগুলি বাতিল করে দেওয়া হয়। এভাবেই চলে এদের নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা। শুধু ফোন নয়, হিউম্যান ক্যুরিয়ারও বহু ক্ষেত্রে কাজে লাগানো হয়। বিশেষ করে কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয় জানানোর জন্য। কারণ, দলের নেতারা ততদিনে বুঝে গিয়েছেন যে, পুলিশ আড়ি পেতে তাদের বহু তথ্য জেনে যাচ্ছেন। পর পর বেশ কয়েকজন ক্যুরিয়ার কয়েক মাসের মধ্যে ধরাও পড়ে গিয়েছে। ফলে নম্বর বদল করে নিজেদের কাজ এগিয়ে চালিয়ে যাচ্ছেন মাওবাদী নেতারা।

অনির্বাণ ফ্রিল্যান্সিং করে শুনেই উৎসাহ যেন একধাক্কায় অনেকটা কমে গিয়েছিল বীক্ষণের। তারপর এমন আচরণ শুরু করলেন যেন সাহায্য করার খুব একটা ইচ্ছে নেই তাঁর, পার্থক্য শুধু একটাই যে অনির্বাণকে তিনি চলে যেতে বলতে পারছিলেন না। একটা লোককে এত তাড়াতাড়ি এভাবে পাল্টে যেতে দেখে একটু অবাকই লাগল তার। ‘তাহলে আজ চলি, আমি তো কয়েকদিন আছি, আপনাকে মাঝে মাঝে একটু বিরক্ত করব।’ ওই বুথ থেকে বেরিয়ে আসার আগে বললো অনির্বাণ। সঙ্গে একটা অনুরোধও জানাল, ‘আপনার নম্বরে একটা মিসড কল দিচ্ছি, একটু আমার নম্বরটা সেভ করে রাখবেন প্লিজ।’ আগেই চা খাওয়া হয়ে গিয়েছিল তার। কাজেই বীক্ষণ খুব একটা আপত্তি করলেন না। চলে আসার আগে শুধু বললেন, কোনও দরকার পড়লে তাঁকে যেন ফোন করে নেওয়া হয়।

কিন্তু এরপর বীক্ষণ কি তাকে আদৌ আর সাহায্য করবেন? এসব সাতপাঁচ ভাবার মতো অতো সময় আর হাতে ছিল না। তাই অপরাধীদের যে ভাবে স্যাডো করা হয় সে ভাবেই কাজ শুরু করল সে। বীক্ষণ ছাড়াও ঝাড়গ্রামের চারজন সাংবাদিকের ওপর ছায়ার মতো ঘুরে বেরানো শুরু করল অনির্বাণ। এ যেন চাকরির এক নতুন অধ্যায়।

প্রথম ২৪ ঘণ্টাতেই অবশ্য বুঝে গেল এরা প্রবল ধুরন্ধর। একদম পাকাল মাছের মতো। ধরলেও ঠিক পিছলে যায়। তাও ঝাড়গ্রাম শহর অবধি ঠিক আছে। ধাওয়া করতে করতে লালগড় পর্যন্ত গেলে সে নিজেই ধরা পড়ে যেতে পারে। কাজেই প্রথম প্রথম ঝাড়গ্রামে কেনেডির চায়ের দোকান কিংবা ডিংডং ফোনের বুথের আশেপাশে থেকে চলতে লাগলো সাংবাদিকদের ওপর নজরদারি। এদের পাশাপাশি সমান নজরদারি চালাতে হচ্ছিল আনন্দ চ্যানেলের কলকাতা থেকে যাওয়া সাংবাদিক দীপের ওপরেও। তিনি আবার অরণ্য সুন্দরী লজে প্রায় এক বছর ধরে ঘাঁটি গেড়ে বসে রয়েছেন। এই ভদ্রলোক আবার অদ্ভুত রকমের। অফিসের রাজনীতিতে সুবিধা করতে না পারলেও উনি কাজের ক্ষেত্রে কোনও আপস করেন না। যেমন, জেলার পুলিশ সুপার একবার তাঁর কাছে মাওবাদীদের কালো পতাকা তুলে স্বাধীনতা দিবস পালনের ফুটেজ চেয়েছিলেন। কারণ, একমাত্র সাংবাদিক

হিসেবে তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অথচ সাহায্য করা তো দূরে থাক, ওই সাংবাদিক এসপিকে জানিয়ে দেন, ওই ছবি পুলিশকে দেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। এটা এথিক্স বিরোধী। ভবিষ্যতে যেন এই ধরনের রিকোয়েস্ট তাঁকে না করা হয়।

ফলে এই ধরনের একবগ্গা লোকদের চোখে চোখে রাখাটাও খুব কষ্টকর। সব সময় এরা পারফেক্ট থাকার চেষ্টা করেন। ফোনেও কিষেণজি এবং ছত্রধরের সঙ্গে যেভাবে কথা বলেন তা থেকে কিছু উদ্ধার করা মুশকিল। তবে কন্ট্রোল রুম থেকে আসা ফিডব্যাকের মাধ্যমে জানতে পারল ছত্রধর প্রকাশ্যেই ওই এলাকায় দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বড়পেলিয়াতে নিজের আড্ডাতেও যাচ্ছেন তিনি। প্রায় রোজ কথা বলছেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে। আবার রাতে নিজের আমলিয়ার বাড়িতে না থেকে থাকছেন দলের কর্মীদের বাড়িতে।

এরই মধ্যে একদিন ঘটল মজার কাণ্ড। ছত্রধরের এক সঙ্গীর ফোন ট্যাপ করে কন্ট্রোল রুমের ডিউটি অফিসার জানতে পারলেন, বেলাটিকরিতে এক বাড়িতে রাতে বসছে বড় ভোজের আসর। রামগড়ের একজনকে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, রাত আটটা নাগাদ তিনটে রামের বোতল এবং তিন কিলো দেশি মুরগির মাংস রান্না করে আনতে। বিষয়টা কী? ফোন থেকেই জানা গেল, ওখানে আসছেন খোদ ছত্রধর। বিকেলে ওই কথাবার্তা রেকর্ড হলেও রাতের দিকে দেখা গেল সবার ফোন বন্ধ রয়েছে। বোঝা গেল পার্টি জমে গিয়েছে।

আসল অ্যাকশন অবশ্য শুরু হল পরদিন সকাল থেকে। জনসাধারণের কমিটির নেতা ফোনে ফোনে তাঁর সব মিটিং বাতিল করে দিলেন। কেন? বেশি বেলায় ফোনের সূত্রেই গোয়েন্দারা জানতে পারলেন, পেটে ব্যাপক সমস্যা দেখা দিয়েছে তাঁর। প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হচ্ছে বারবার। তাই সব কর্মসূচী বাতিল। আগের রাতে ঠিক কতটা মোচ্ছব হয়েছিল সেটাও বোঝা গেল ওই ঘটনা থেকে।

এখানেই শেষ নয়। এর ঠিক এক সপ্তাহের মাথায় ছত্রধরের ফোন নম্বর ট্র্যাক করে জানা গেল জনসাধারণের কমিটির পক্ষ থেকে প্রতিটি এলাকার সদস্যদের কাছে নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে তাদের অঞ্চলের সমস্ত লাইসেন্সড গান বাজেয়াপ্ত করে, তা কমিটির শীর্ষ নেতাদের কাছে জমা করতে হবে। আন্দোলন পর্বের বহু আগে থেকেই ওখানকার একাধিক ব্যবসায়ী নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত বন্দুক নিয়ে রেখেছিলেন। ছত্রধর রাতে ফোন করে সেই নির্দেশ পৌঁছে দিলেন দলের নিচুস্তরের কর্মীদের মধ্যে। এমনকী পরদিন থেকেই সেই কাজ শুরু করার নির্দেশও দেওয়া হল একইসঙ্গে। কমিটির কম বয়সী সদস্যরা তখন রীতিমতো ফুটছে। ফলে শুরু হয়ে গেল তাদের দাপাদাপি।

লালগড়ের ধরমপুর। সকালেই দেখা গেল সি পি এম অফিসের ঠিক উল্টো দিকে সাংবাদিকদের সামনেই স্থানীয় এক মুদি দোকানের মালিকের আর্মসটি কার্যত ছিনতাই করে নিল কমিটির দুই সমর্থক। সারাদিন ধরে টিভি চ্যানেলে চলল সেই ছবি। প্রথম দিকে খানিকটা সন্দেহ থাকলেও মাওবাদীদের তরফে এই ধরনের নির্দেশ কে দিয়েছিল তা অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেল পরের দিন।

তিনি আর কেউ নন, কিষেণজির ডান হাত বলে পরিচিত বিকাশ। রোজ রাতে কিষেণজির সঙ্গে গোপন ডেরায় দেখা করে পরের দিন কী করতে হবে তা বিকাশ ফোনেই জানিয়ে দিতেন ছত্রধরকে।

পুরো এলাকা জুড়ে বিস্তর ঘোরাঘুরির পর তিনদিনের মাথায় লালবাজারে নিজের সরেজমিন অনুসন্ধানের রিপোর্ট পাঠালো অনির্বাণ। সেই রিপোর্ট বস খুঁটিয়ে পড়লেন। বেশ কয়েকটি জায়গায় তাঁর প্রশ্ন থাকায় সেটাও সরাসরি জেনে নিলেন জঙ্গলমহলে কাজ করা বিশ্বস্ত জুনিয়রের কাছ থেকে। বেশ কয়েকদিনের নজরদারির পর দেখা গেল দলীয় কাজের ফাঁকে কিষেণজি যে প্রান্তেই থাকুন না কেন, রোজ সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন।

অদ্ভুত বিষয় হল, এদের মধ্যে অধিকাংশ সাংবাদিককে তিনি শুধু নামে চেনেন। তাদের কোনও দিন সামনাসামনি দেখেননি। একদিন কিষেণজির ফোনে আড়ি পাততে গিয়ে শোনা গেল একটি চ্যানেলের গাড়ির চালক পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে ফোনে কথা বলছে। এই একটি ছোট ঘটনা এসটিএফের গোয়েন্দাদের মনোবল এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়িয়ে দিল। তারা বুঝে গেলেন, এটাই হল সেই মোক্ষম সময়, যখন ওই মাওবাদী নেতার কাছাকাছি পৌঁছে যাওয়া সম্ভব।

লালবাজারের ঠান্ডাঘর ছেড়ে অনির্বাণ অবশ্য গ্রাউন্ড জিরোতে দাঁড়িয়েই এটা বুঝতে পারছিল যে, তারা যেমন সাংবাদিকদের গতিবিধির উপর নজর রাখছে ঠিক তেমনই মাওবাদীরাও পাল্টা সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের গতিবিধির খোঁজ নিচ্ছে। মাওবাদীদের জানার পরিসরটা অবশ্য অন্য। কেউ পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে কি না, কিংবা খবরাখবর দিচ্ছে কি না সেই তথ্য নিজস্ব চ্যানেলে নিয়মিত পেয়ে যাচ্ছিল তারা। ওই কাজের অনেকটা দায়িত্ব ছিল বীক্ষণের ঘাড়ে। তাঁর মাধ্যমে কে কোথায়, কী করছে তা রোজ রাতে জেনে যেতেন খোদ কিষেণজি। কোন চ্যানেলকে কোন খবরটা দিতে হবে, কোন সাংবাদিককে কখন ব্যবহার করতে হবে, এই বিষয়ে ততদিনে কার্যত মাস্টার হয়ে উঠেছিলেন মাওবাদী নেতা।

বীক্ষণ প্রথম দিন তাকে পাত্তা না দিলেও কাজের কাজ যেটা হয়েছিল তা হল কিষেণজির নতুন নম্বরটা পেয়ে যাওয়া। ওখান থেকে বেরিয়েই সরাসরি কিষেণজিকে ফোনও করেছিল সে। নিজেকে এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালের ট্রেনি রিপোর্টার হিসেবে পরিচয় দেয়। প্রথমটায় কিষেণজি কথা বলতেই চাননি। বরং জানতে চান, কোন কোন সাংবাদিক আপনাকে চেনে? গড়গড় করে বেশ কয়েকজনের নামও বলে দেয় অনির্বাণ। তিনি ফের জানতে চেয়েছিলেন, 'আপনাদের খবর কোথায় দেখানো হয়?'

অনির্বাণ জবাব দিয়েছিল, 'সিঙ্গাপুর টিভি-সহ আরও বেশ কয়েকটি জায়গায়।' শুরুর দিকে কিষেণজি তার সঙ্গে শুধুমাত্র ফোনে কথা বলতেন। তারপর একদিন নিজেই বলে বসেন, 'আমাকে ফোনে না পেলে আপনি ঝাড়গ্রামের সাংবাদিক বীক্ষণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবেন। ওনাকে আমরা বিশ্বাস করি। বীক্ষণবাবুই আপনাকে রোজ খবরের ব্যাপারে সাহায্য করবেন।'

—'আসলে আমি ওনার সঙ্গেই প্রথমে যোগাযোগ করি। উনি তেমন একটা আগ্রহ দেখাননি। তাই আপনাকে রোজ ফোন করতে হয়।' বলেছিল অনির্বাণ।

'ঠিক আছে আমি ওনাকে বলে দেব আপনাকে সাহায্য করতে। অসুবিধা হবে না।' আশ্বাস দিলেন রাজ্যের এক নম্বর মোস্ট ওয়ান্টেড।



পরের দিন থেকেই অদ্ভুত ভাবে বদলে গেলেন বীক্ষণ। একটা যেন বাড়তি খাতির পাওয়া শুরু করল অনির্বাণ। বাড়িতে ডেকে নিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা আলোচনা চলত চা সহযোগে। একদিন বীক্ষণ তাকে জিজ্ঞাসাও করলেন, 'আচ্ছা ব্রাদার, আপনি তো আবার পান-টান করেন না? আমি তো করি। কলকাতার সাংবাদিকরা এলে জোর করে, তাই ওদের সঙ্গে বসতে হয়। আসলে ওরা আমাকে খুব পছন্দ করে।'

কেমন করে, সেটা অনির্বাণের চেয়ে ভালো আর কে জানে? কার্যক্ষেত্রে প্রায় প্রত্যেক সাংবাদিক ভয়ংকর রকমের ধূর্ত। তারা কী কাজ করেন, তা নিজেদের ডান হাত, বাঁ হাতও জানতে পারে না। একেকজনের ফোনে কথাবার্তা শুনলে বোঝা যায় কে কতটা সেয়ানা। তাদের মধ্যে কম্পিটিশনটা এত বেশি যে কেউ কাউকে ভুল খবর করিয়ে দিতেও পিছপা হয় না।

এরই মধ্যে কেটে গিয়েছে প্রায় একমাস। খানিকটা কনফিডেন্সে আসা গিয়েছে বুঝতে পেরে এরই মধ্যে একদিন কিষেণজিকে ফোন করে অনুযোগের ভঙ্গিতে অনির্বাণ বলল, 'আপনার এত খবর আমাদের ওয়েবসাইটে বেরোয়। আপনাকে সব লিঙ্কও পাঠিয়ে দিই। কিন্তু আপনি আমার সঙ্গে দেখা করেন না কেন? অন্য সবাই তো আপনার সাক্ষাৎকার পেয়ে গিয়েছে, আমাকেও একবার দিন।'

কী মনে হল কিষেণজির, তিনি বললেন, 'চলে আসুন একদিন। তবে আসার আগে ফোন করে নেবেন।'

শীর্ষ মাওবাদী নেতার বিশ্বাস অর্জন করা গিয়েছে এটা ভেবেই একটা অদ্ভুত তৃপ্তি হল অনির্বাণের। মানসিক প্রস্তুতিও শুরু করে দিল তখন থেকেই। দু'দিন বাদে ফোন করেই বসল—'কাল একবার দেখা করা যায় আপনার সঙ্গে?'

—'চলে আসুন তাহলে। সকালে আমি জানিয়ে দেব কোথায় আসবেন।' বললেন কিষেণজি। তখন তিনি দেখা করার ক্ষেত্রে তেমন কোনও বাছবিচার করছেন না।

পরের দিন সকালে ফের ফোন করতেই পিড়াকাঁটার কাছে লক্ষণপুরে চলে আসতে বললেন একবারে। তবে সরাসরি আসা যাবে না। ওখানে বিশুর চায়ের দোকানে দাঁড়াতে হবে অনির্বাণকে। একটা হলুদ গেঞ্জি পরা যুবক এসে বাইকে করে তুলে নিয়ে যাবে জঙ্গলের অন্দরে।

টেনশনে হুড়োহুড়ো করে তৈরি হয়ে নিল সে। ব্যাগে একটা ছোট ক্যামেরা, ছোট রেকর্ডার সহ একগাদা ভিজিটিং কার্ড নিতে ভুলল না। কে জানে, হয়ত মাওবাদী নেতা চাইতে পারেন। হোটেল থেকে তাড়াতাড়ি না বেরতে পারলে লালগড়, রামগড় উজিয়ে প্রায় সত্তর-আশি কিলোমিটার দূরের পিড়াকাঁটা পৌছতেই অনেক দেরি হয়ে যাবে। আন্দোলনের জন্য জঙ্গলমহলে বিভিন্ন জায়গায় যখন-তখন হামেশাই রাস্তা কেটে দেওয়া হচ্ছিল সেসময়, পুলিশের গ্রামে ঢোকা আটকাতে। ফলে ঝাড়গ্রাম-সহ আশপাশের এলাকায় যে সব যুবকের বাইক রয়েছে তারা সারাদিনের জন্য মোটা টাকার বিনিময়ে নিজের বাইক ভাড়ায় খাটানোর ব্যবসা শুরু করে দিয়েছিল। যে হোটেলে অনির্বাণ থাকছিল, তার গা লাগোয়া এলাকার রাজু নামে এক যুবক এই কাজটা করত। প্রতিদিন ফুল ট্যাঙ্ক তেল এবং ২০০ টাকার বিনিময়ে ওদের বাইকের পিছনে চেপে ঘুরে বেড়ানো যেত সারাদিন। মাঝেমধ্যে তিনজন

থাকলেও আপত্তি করত না রাজু। শুধু দুপুরে লালগড় বাজারে বউদির হোটেলে একবার খাইয়ে দিলেই হল। তো এই রাজুকে ফোন করে আধঘণ্টার মধ্যে তৈরি হয়ে নিতে বলাতে সে রাজি হয়ে গেল ।

'টাকা কথা রাখে।' রাজুও কথা রাখল। আধঘণ্টার বহু আগে চলে এল হোটেলের নীচে। তারপর ফোন করে জানাল নিজের উপস্থিতির কথা।

হোটেলের ঘরে তৈরি হয়েই ছিল অনির্বাণ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নেমে এল। চেপে বসল বাইকে। ঝাড়গ্রাম থেকে অনেকটা পথ যেতে হবে। পথে দহিজুড়ি, লালগড়, কাঁটাপাহাড়ি পেরিয়ে রামগড় অবশেষে পিড়াকাঁটা। স্থানীয় লোকেদের কাছ থেকে জেনে নিল কোনটা বিশুর দোকান। বেলা বেড়ে যাওয়ায় দোকানে ভিড় অপেক্ষাকৃত কম। দু'টো চায়ের অর্ডার দিয়ে মোবাইলে গেম খেলা শুরু করল সে। জঙ্গলমহল এলাকার এই সব ছোটখাট চায়ের দোকানে গরম ঝুড়ি ভাজা এবং বুঁদিয়ার স্বাদ মুখে লেগে থাকার মতো। দেখা গেল, ওই দোকানেও সুস্বাদু খাবারটি তৈরি করা হচ্ছে। লোভ হল এবং দু'প্লেট ওই খাবার পাওয়াও গেল চটাপট। গরম চাও এসে গেল বেশ তাড়াতাড়ি।

খাবার খেয়ে দাম মেটাতে মেটাতেই চোখ পড়ল একটু দূরে হলুদ টিশার্ট পরা এক যুবক বাইক নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। রাজুকে এই দোকানেই অপেক্ষা করতে বলে নিজের ব্যাগটা নিয়ে হাঁটা লাগাল সে। সামনে যেতেই যুবক বলল, 'আপনি ঝাড়গ্রাম থেকে এসেছেন?'

—'হ্যাঁ, কেন?' কৌতূহল হল অনির্বাণের।

'আপনি যার বাইকে এসেছেন তাকে বলবেন ফেরার সময় উল্টোদিক দিয়ে অর্থাৎ মেদিনীপুর হয়ে যেতে। রামগড়ের কাছে যৌথ বাহিনী ঘোরাঘুরি করছে।' সতর্ক করল যুবক।

'ঠিক আছে। বলে দেব।' অনির্বাণ তখন নিজের ফোকাস ঠিক করে ফেলেছে।

এ রাস্তা, সে রাস্তা করে একটা জঙ্গলের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলল বাইক। অনির্বাণ অবাক হল এটা ভেবে যে, তার চোখ খোলা রেখে দিব্যি নিয়ে যাওয়া হচ্ছে এমন একজনের কাছে, যাকে বাস্তবেই খুঁজছে বিভিন্ন মুলুকের পুলিশ। যেতে যেতে একবার ভাবনায় এল, নিজের মোবাইলে পুরো জার্নির ছবিটা তুলে রাখা যেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই মনে হল, লাভ নেই তাতে। কিষেণজি কি আর এক জায়গায় বসে থাকেন নাকি? এক জায়গার ছবি তুলেই বা কী হবে?

কাজেই সাতপাঁচ আর না ভেবে চলন্ত বাইকের পিছনের সিটে বসেই এগিয়ে চলল গন্তব্যের দিকে। মিনিট চল্লিশেক যাওয়ার পর জঙ্গলের এমন একটা জায়গায় বাইকটা থামিয়ে তাকে নামিয়ে দেওয়া হল, যেখানে দিনের বেলাতেই বেশ অন্ধকার লাগছিল। হলুদ টি শার্ট পরা ছেলেটি ডিগ ডিগ আওয়াজ তুলে কোথায় একটা চলে গেল। বড় বড় গাছের নীচে একা দাঁড়িয়ে থাকার সময়, গা ছমছমে পরিবেশে কেমন অস্বস্তি লাগছিল। এখান থেকে আবার কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে?

ভাবতে ভাবতেই সামনে এসে দাঁড়াল একটা বাইক। আরে, সেই ছেলেটি তো! যে তাকে এখানে নিয়ে এসেছে। হলুদ টি-শার্ট ছেড়ে এখন তার পরনে একটা নীল রঙের জামা। বাইকটাও পাল্টে গিয়েছে। গামছা দিয়ে মুখটা অদ্ভুত ভাবে বাধা। 'চলুন', যেন নির্দেশ দিল সে। কোনও কথা না

বাড়িয়ে বাইকে ফের চেপে বসল রিপোর্টার সেজে আসা অনির্বাণ। একটা ভরসা ছিল, যতই ভিতরে যাক না কেন, মোবাইল ফোনের টাওয়ার ট্র্যাক করে লালবাজার জেনে যেতে পারছে তার সঠিক অবস্থান।

দ্বিতীয় দফায় আরও প্রায় দশ কিলোমিটার পথ পেরোতে হল। বাইক থেমে গেল একটা উঁচু টিবির মতো জায়গায়। অনির্বাণকে সেখানে নামিয়ে ফের কোথাও উধাও হয়ে গেল যুবকটি। ফিরল অবশ্য মিনিট দশেকের মধ্যে। তার বাইকের পিছনে বসা একজন। রোগা করে, মুখ গামছা দিয়ে ঢাকা। সামনে আরও একটি বাইকে অন্য একটি ছেলে দু'জনকে বসিয়ে নিয়ে আসছে। একদম পিছনে আরও একটা বাইকে দু'জন। সবার ঘাড়ে একটা করে ইনস্যাস। বুঝতে দেরি লাগল না বাকিরা আসলে শীর্ষ মাওবাদী নেতার দেহরক্ষী। একটু ভয় করছিল বটে। তবে একটা ভরসারও জায়গা ছিল তার কাছে, সেটা হল, পুলিশ হওয়ার কোনও রকম প্রমাণপত্র অন্তত ওই মুহূর্তে সঙ্গে নেই। লালমাটির ধূলোধূসরিত পথ ধরে ঝড়ের গতিতে সামনে এসে দাঁড়াল তিনটি বাইক।

একটি থেকে নেমে এলেন এমন একজন, যিনি প্রায় দেড় বছর ধরে এ রাজ্যের পুলিশকে ল্যাজে খেলাচ্ছেন। পরনে সেই সবুজের মধ্যে কালো চেক জামা, যা টিভি চ্যানেলের দৌলতে ততদিনে পরিচিত, ঘরে ঘরে। সেই ভাঙা গলার স্বর। মুখটা পুরোপুরি ঢাকা লাল কালো চেক গামছা দিয়ে। পরনে একটা ঢোলা ট্রাউজার্স। পিঠে লম্বালম্বি করে আটকে রাখা ইনস্যাস।

সামনে এসে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে হাতটা বাড়িয়ে দিলেন তিনি। ইচ্ছে করছিল না। কিন্তু সেই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় শত্রুর সঙ্গে হাতটা মেলাতেই হল। কোথায় একটা লেখায় যেন পড়েছিল, সেটাই মুহূর্তে মাথায় এল, কোনও দীর্ঘ লড়াইয়ে জিততে হলে প্রথম কয়েক কদম পিছিয়ে যেতে হয়। এগোতে হয় তারপর।

'খেয়ে এসেছেন আপনি? বাড়িতে সবাই ভালো আছেন?' কর্কশ স্বরেও যেন স্নেহের টান।

অনির্বাণ ভাবছিল, এই লোকটাই ঠান্ডা মাথায় এত লোককে খুন করার নির্দেশ দেয়? আসলে এনার মুখ আর মুখোশটা আলাদা করা খুব কঠিন। যাই হোক, সাময়িক ভাবে নিজেকে সামলে নিয়ে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, সবাই ঠিক আছে।'

প্রাথমিক জড়তা কাটাতে খানিকক্ষণ সময় নিলেও নিজে ক্যামেরাটা ধরে ল্যাপেলটা (সাউন্ড রেকর্ডার) কিষেণজির জামায় লাগিয়ে কাউকে কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে পিছনে চলে গেল সে। সঙ্গে থাকা কিষেণজির এক সঙ্গী বলে উঠল, 'আপনি জানেন দেখি সব। আগে আপনাকে কখনও দেখিনি তো? আপনি কোন চ্যানেলের?'

জবাব দিল অনির্বাণ, 'আমাকে ডাকা হয়নি কখনও। আমি এসেছিও অনেক পরে। এরপর ডাকলেই আসব। আর আমার এটা দেখানো হবে সিঙ্গাপুর টিভিতে।'

একবার বলতে শুরু করলে থামতে চান না কিষেণজি। বীক্ষণের মধ্যেও এই গুণটা রয়েছে প্রবল ভাবে।

সাক্ষাৎকার নিতে নিতে আধঘণ্টা কেটে গেল। এবার একটু ফাঁকা হয়ে কিষেণজির সঙ্গে অন্য নানান বিষয়ে আলোচনা শুরু করে দিল সে। বাড়ির, দেশের এবং দশের। লোকটা সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে সত্যি বহু খবর রাখেন। 'কী করে এসব খবর পান?' কৌতূহল থেকেই প্রশ্নটা করে ফেলেছিল সে। কিষেণজি জবাব দিলেন, 'কেন, আমার নিজের ল্যাপটপ আছে। রোজ সকালে আপনারা ঘুম থেকে ওঠার আগে আমি সব কাগজ এবং ওয়েবসাইট পড়ে নিতে পারি। তাছাড়া আপনারাও তো আসেন, ফোন করেন। সেখান থেকেও অনেক কিছু জানা যায়।' এক কথা দু'কথায় আলোচনা জমে উঠেছিল। জানা গেল, প্রধান দেহরক্ষী হিসেবে ২৪ ঘণ্টাই নেতার সঙ্গে থাকেন বিশ্বস্ত সুষেণ।

কিন্তু বাধ সাধল একটা অজানা ফোন। কেউ একজন সুষেণকে ফোন করে জানিয়েছে 'দাদাকে সরে যেতে বলুন, পিড়াকাঁটার রাস্তায় যৌথ বাহিনী টহল দিচ্ছে।' আচমকা যেন বজ্রপাত। মাওবাদী নেতার চোয়াল শক্ত হয়ে গেল। 'আজ তাহলে আসি। পরে দেখা হবে।' বলেই প্রায় লাফিয়ে বসলেন একটা বাইকে। ঝড়ের গতিতে যেন উড়ে চলল সেই বাইক। উবে গেলেন চোখের পলক পড়ার আগে।

আর তো কিছু করার নেই। অনির্বাণ নিজের ক্যামেরায় আশপাশের একটু ছবি তুলে নিয়ে রেডি হল ফিরে আসার জন্য। মন বলল, যাই হোক না কেন, পরিচয় গোপন করে এতটা চলে আসা তার কাছে অন্তত বিরাট বড় ব্যাপার। নীল জামা ছেলেটি তাড়া দিল 'চলুন।' তাকে ওখানে রেখে দেওয়া হয়েছে অনির্বাণকে ফের বিশুর দোকান পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার জন্য। ঘড়ি মিলিয়ে অনির্বাণ দেখল পরবর্তী পঞ্চাশ মিনিটের মধ্যে চলে আসা গিয়েছে ওই চায়ের দোকানে।


TV

বিশুর দোকানে পৌঁছে গিয়ে উত্তেজনায় থাকতে না পেরে সরাসরি বসের নম্বরে ফোন করে ফেলল। তিনি জানতে চাইলেন, 'ফিরে এসেছো? এখন তুমি নিশ্চয়ই টায়ার্ড? হোটেলে ফিরে একটা রিপোর্ট ফর্মে পুরোটা মেল করে পাঠাও।' ফুরফুরে মন নিয়ে সন্ধ্যায় হোটেলে ফিরে গরম চায়ে চুমুক দিতে দিতে সারাদিন কাজকর্মের একটা রিপোর্ট তৈরি করতে বসল।

বসকে মেলটা পাঠিয়ে রাতে প্রেমিকাকে ফোন করে গল্প করতে ইচ্ছে করছিল ভীষণ। করলও তাই। আজ কেমন যেন নিজেকে হাওয়ায় উড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছিল।

সাতসকালে বসের ফোনে ঘুম ভাঙল। লোকটা পারে বটে, এত সকালে পুরোটা পড়ে নিয়েছে। 'ভেরি গুড। কিপ ইট আপ।' শুরুতেই বললেন তিনি। তারপর হালকা করে জানতে চাইলেন, 'আচ্ছা, তুমি যেখানে দেখা করলে সেখান থেকে পিড়াকাঁটা কতটা দূর ছিল?' 'স্যার, পঞ্চাশ মিনিট বাইকের রাস্তা।' জবাব দিল সে।

'দেখে কী মনে হল? অপারেশন সম্ভব?' যেন বিষয়টা বুঝতে চাইছিলেন রাকেশ।

'করা যায় স্যার। তবে একটু বুদ্ধি করে করতে হবে। কিষেণজিকে কনফিডেন্সে নেওয়া গিয়েছে। যদি আমাদের কয়েকজনকে তৈরি করে মিডিয়ার লোক বানিয়ে রেডি হয়ে ঢোকা যায় তাহলে সম্ভব। ওরা চেকিং করে না এখন। তবে ভালো একটা ব্যাক আপ টিম দরকার। বেরিয়ে আসার জন্য। কিষেণজি কোথায় আছেন সেটা চিহ্নিত করা খুব একটা কঠিন নয়। এখনই সেরা সুযোগ স্যার।' এক নিঃশ্বাসে কথা বলে থামল যখন, বুঝতে পারল রাকেশ কিছু একটা ভাবছেন।

'ঠিক আছে, দেখা যাক। আমি কাল কথা বলে দেখছি।' ফোন কাটলেন বস।

পরের দিন সকাল। ফের ফোন বেজে উঠল তার। দৌড়ে গিয়ে দেখল বসের কল।

'বলুন স্যার।' গলায় যেন একটু জোর পেয়ে গিয়েছে সে।

'শোনো অনির্বাণ, আমরা কিষেণজির অপারেশনটা এখন করছি না। আরও কিছুদিন স্যাডো করো। তারপর দেখা যাক।' নির্দেশ এল বসের।

অনির্বাণ ভাবল, তাহলে কি সরকার অনুমতি দেয়নি কিষেণজির বিরুদ্ধে অলআউট যাওয়ার?

কিন্তু এই প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

একসপ্তাহ জঙ্গলমহলে কাজ করার পর কলকাতা ফিরে আসতে বলা হল তাকে। বসের নির্দেশ, 'আপাতত কিছুদিন এখানে থেকে কাজ করো। পরবর্তী কী করতে হবে তা জানিয়ে দেওয়া হবে।'

তারপর আবার প্রতীক্ষা দু'সপ্তাহের।

বসের ঘরে সেদিন সন্ধ্যায় কথা বলার মাঝেই হুড়মুড় করে ঢুকলেন আর ও বাবু। এসটিএফের রিজার্ভ অফিসার। মহা কুচুটে লোক। সম্ভবত ঘুম থেকে উঠে ঠিক করে নেন সেদিন কার পিছনে বাঁশ দেবেন। টিপিক্যাল কেরানি মার্কা। খালি ফাইল বোঝেন। আর কিচ্ছু নয়। সে বছর এসটিএফের ব্যবহারের জন্য তিনটি বোলেরো গাড়ি এসেছিল। অনির্বাণরা তাই এই আর ওর সংক্ষিপ্ত নাম দিয়েছিল বোলেরো-৪। অর্থাৎ বাস্টার্ড আর ও। তো এই আরও বাবু কথার মাঝেই ঘরে ঢুকে

বললেন, 'স্যার, আমি এবার আগেই পুজোর ল এন্ড অর্ডারের ডিউটি চার্ট করেছি। কিন্তু অনির্বাণ বলছে ও এই ডিউটি করতে পারবে না। ছুটি নেবে। তাই সেটা আপনাকে জানাতে এলাম।'

বস পুরো নালিশটা শুনলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'ওর নাম ডিউটি রোস্টার থেকে বাদ দিয়ে দিন।'

গালে যেন একটা বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় পড়ল এই আরও বাবুর। তবে কোনওক্রমে নিজেকে সামলে নিয়ে ফের বলার চেষ্টা করলেন, 'তাহলে কাদের ডিউটি দেব স্যার। সবাই তো এবার না করে দেবে।'

বহু দিন পর বস কে রেগে যেতে দেখল সে। প্রায় চিৎকার করে রাকেশ জবাব দিলেন, 'অনির্বাণ পুজোর ডিউটি করবে না, ছুটি নেবে, এটা আমার অর্ডার। আর দ্বিতীয় অর্ডারটা হল, সেই জায়গায় আপনাকে ডিউটি করতে হবে। বাংলাতে বললাম। আশা করি বুঝে গিয়েছেন। এখন আসতে পারেন'।

দু'সপ্তাহও কাটল না। পুজো প্রায় তখন দোড়গোড়ায়। একদিন ডাক পড়ল তার। রাকেশ ডেকে পাঠালেন অনির্বাণকে।

— 'তুমি চলে যাও ওখানে।'

পুজোর মধ্যে সারা কলকাতা তখন মেতে গিয়েছে নিজস্ব আমেজে। আর নিজের জীবনের সবকিছু অর্থাৎ বাড়িঘর, শখ,আহ্লাদ, প্রেম স্যাক্রিফাইস করে অনির্বাণকে চলে আসতে হল এমন একটা জায়গায় যেখানে প্রতি পদে মৃত্যুভয়। এখানে আসা ইস্তক যারা সামান্য কথাবার্তা বলছে বা খোঁজখবর নিচ্ছে, তারাও আসল পরিচয় জানতে পারলে ঘৃণায় ভরিয়ে দেবে ওকে। এটা আর কেউ না জানুক, সে অন্তত ভালোভাবেই বোঝে।

বসের পরামর্শ ছিল, পুজোর সময়টা এইসব অপারেশন চালানোর জন্য আদর্শ। কারণ, শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গ নয়, আন্দোলন ভুলে জঙ্গলমহলের বাসিন্দারাও পুজোর আনন্দে মেতে থাকবে। তাছাড়া সারা বছর ধরে মাওবাদীরা নানারকম ভাবে গ্রামের লোকেদের জোর করে আন্দোলনে টেনে আনলেও পুজোর চারদিন মন খুলে আনন্দ করার সুযোগ দিয়েছে। সেটাও হয়েছে কিষেণজির নির্দেশে। ষষ্ঠীর দিন বস মোট দু'বার ফোন করলেন অনির্বাণকে। রাতের ফোনটায় অনেকক্ষণ ধরে কথা হল দু'জনের। রাকেশ সম্ভবত বুঝতে পেরেছিলেন জুনিয়র সহকর্মীর মনের কথা। শান্ত্বনা দেওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন-'ভালো কিছু পেতে গেলে কষ্টের একটা লম্বা পথ পেরোতে হয়, মনে করো তুমি এখন সেই পথটা ধরেই হাঁটছ।'

কথাগুলো শুনতে ভালো লাগছিল বটে কিন্তু বাস্তব হল, ততদিনে একটা হতাশা পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলেছিল তাকে। নিজের রোজকার রুটিনে এই বিরক্ত বেশি করে এসেছিল। সকালে ঘুম থেকে উঠে হোটেলের ঘর লাগোয়া বারান্দায় ফ্রি-হ্যান্ড ব্যায়াম। তারপর ব্রেকফাস্ট নিয়ে বীক্ষণ-সহ একাধিক স্থানীয় সাংবাদিককে ফোন করে সেদিন সম্ভাব্য কী কী রয়েছে তা জেনে নেওয়া। প্রয়োজনে তাদের কারও বাইকের পিছনে সওয়ারি হয়ে চল্লিশ কিলোমিটার পথ পেড়িয়ে লালগড় যাওয়া। দুপুরে সময়

পেলে সেখানকার বাজারে বৌদির দোকানে দুপুরের খাবার খেয়ে টুকটাক কাজ সেরে ক্লান্ত শরীরে এমন সময়ে হোটেলে ফিরে আসা যখন একরাশ অশান্তির ভয় মাখানো শহরটা সব কিছু কাটিয়ে পুরোপুরি মেতে গিয়েছে পুজোর আনন্দে। ষষ্ঠীর রাতে বসকে সে জানাল, এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে ছত্রধর মাহাতোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষী অনেকটাই কমে এসেছে। ছত্রধর যে ভাঙাচোরা সাদা অ্যামবাসাডারটা নিয়ে এলাকায় ঘুরে বেড়াতেন সেই গাড়ির চালক পাপন সম্ভবত এলাকায় নেই। যে যুবক বাইকে করে ছত্রকে এদিক ওদিক পৌছে দিতেন, সেই শ্যামলকেও আপাতত এলাকায় দেখা যাচ্ছে না। ফলে তাঁকে তুলে নেওয়ার এটাই সুবর্ণ সুযোগ। রাকেশ তাঁর অধস্তন কর্মীর কাছ থেকে মন দিয়ে পুরোটা শুনলেন। তারপর বললেন, 'তুমি প্রস্তুত থাকো।'

অনির্বাণের হোটেলের খুব কাছে রবীন্দ্র কানন নামে একটি পার্কে বেশ ধুমধাম করে পুজো হচ্ছিল। বসের সঙ্গে কথা বলার পর ষষ্ঠীর রাতে একটা সাধারণ পোশাকে পুজো দেখতে বেরিয়ে ছিল। রবীন্দ্র কাননের কাছে গিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বউ, ছেলেকে নিয়ে সেখানে পুজো দেখতে এসেছেন বীক্ষণ রায়। ইচ্ছে করেই তাদের কাছাকাছি গেল না সে।

সপ্তমীর সকাল। বেশ খানিকটা তাড়াতাড়ি ঘুম থেকে উঠে টিভি চালিয়ে একটা সিনেমা দেখতে বসেছিল সবে। আচমকা বেজে উঠল মোবাইল ফোনটা। ওপ্রান্তে বস। 'অনির্বাণ, কাল আমরা কাজটা কমপ্লিট করে ফেলতে চাই। আর ইউ রেডি? তোমার কি মনে হয়, সিচ্যুয়েশন আমাদের ফেভারে রয়েছে?'

—'ইয়েস স্যার। আপনি নির্দেশ দিলেই কাজটা কমপ্লিট করে ফেলা যাবে।'

'ওকে, আজ রাতে ব্যাকআপ ফোর্স লালগড় থানায় পৌঁছে যাবে। রাতে তোমার হোটেলে এক কমান্ডো অফিসারও যাচ্ছেন। ওই তোমাকে পুরো বিষয়টিতে সাহায্য করবেন। আমরা এই নম্বরেই তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করে নেব। বাকি কথা পরে হবে।' বললেন বস।

বসের সঙ্গে কথা বলতে বলতেই দেখতে পেল, তার নম্বরে ক্রমাগত ফোন করে চলেছেন বীক্ষণ। মিনিট পাঁচেকের মধ্যে মিসড কলের নম্বরে রিংব্যাক করতেই গলা প্রায় গদগদ করে তিনি জানতে চাইলেন, 'কী ব্যাপার, ঘুম থেকে উঠেছেন তো? আজ ঠিক করেছি আর লালগড়ের দিকে যাব না। পুজোর বাজারে তেমন কোনও খবর হওয়ার সম্ভবনাও কম। তাছাড়া আমার ছেলের জন্মদিন আজ। আপনার বৌদি বলছিল, রাতে এই গরিবের ঘরে খাবার খেতে আপনি যদি আসতেন, তাহলে আমরা সবাই খুশি হতাম।'

গত তিন-চার মাসে বেশ কয়েকবার যাওয়াতে বীক্ষণের সঙ্গে রীতিমতো পারিবারিক ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে তার। এখানে আসার দিন কয়েক আগে প্রেমিকার সঙ্গে শপিংমলে গিয়ে বীক্ষণের স্ত্রীর জন্য সাড়ে তিন হাজার টাকা দিয়ে একটা শাড়ি কিনে তা উপহার হিসেবেও দিয়েছে। তবে আজ একটু কৌশলের সঙ্গে জবাব দিল, 'চিন্তা করবেন না। ঠিক সময়ে আপনার বাড়ি পৌছে যাব। আপনি আমার দাদার মতো। তাছাড়া বউদি যখন বলেছেন, তখন তো যেতেই হবে।'

ফোনটা রাখার পর অপারেশনটাকেই পাখির চোখ করে প্রস্তুতি শুরু করে দিল সে। প্রথমেই একটা ছোট্ট চিরকুট তৈরি করে ফেলল। তাতে পরিকল্পনার একটা সম্ভাব্য এবং সংক্ষিপ্ত চিত্রনাট্য লেখা হল। লিখতে লিখতেই মাথায় এল তাকে অ্যাসিস্ট করতে যাকে পাঠানো হচ্ছে সে আদৌ ক্যামেরা চালাতে জানে তো? যদিও রাতে এই বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে নেওয়ার সুযোগ থাকছে। তাছাড়া কে আসছে, সেটাই তো তার পুরোপুরি জানা নেই। এখন অবশ্য অতশত ভাবার সময়ও কম। দ্রুত করতে হবে সবকিছু।

দুপুরে খাওয়াদাওয়ার পর হোটেল থেকে একটু বাইরে যেতে হল। বীক্ষণের ছেলের জন্য একটা ভালো গিফট কেনা প্রয়োজন। খালি হাতে একটা অনুষ্ঠান বাড়ি না হলে যাবেই বা কী করে? কাউকে দিয়ে যে আনাবে, সে উপায়ও নেই। পুজোর সময় এমনিতেই হোটেলে আবাসিক কম। প্রায় নেই বললেই চলে। আর পুজো বলে হোটেলের কর্মীদের মধ্যে বেশির ভাগকেই ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবছর পুজো বেশ খানিকটা এগিয়ে সেপ্টেম্বর মাসে পড়েছে। সব মিলিয়ে এই সময়টাই তাদের পক্ষে এক্কেবারে আদর্শ। মহালয়ার কয়েকদিন আগেই তাকে জঙ্গলমহলে আসতে বলা হয়েছিল। তার অবশ্য কারণও ছিল। বসের ইচ্ছে ছিল অপারেশনটা শেষ করে দেবেন তখন। কিন্তু চতুর্থীর দিন সকালে বসই ফোন করে জানিয়ে দেন, ওটা একটু পিছিয়ে দিতে হবে। খানিকটা অবাকই লেগেছিল অনির্বাণের। আর এবারে, বস নিজেই ফোন করে বলছেন কাজটা সেরে ফেলা প্রয়োজন।

গিফটটা কিনে হোটেলে ফিরে চা খাওয়ার পর ঘর লাগোয়া বারান্দায় ক্যামেরাটা নিয়ে দাঁড়াল অনির্বাণ। এই ক'দিন ক্যামেরাটা ভালোই কাজ করেছে। কারণ, প্রতিদিন ব্রডব্যান্ডের মাধ্যমে এসটিএফের তৈরি 'চ্যানেলের' জন্য ছবি পাঠাতে হত। ঘটনাটা হল, নিজেকে সাংবাদিক পরিচয় দিলেও অনির্বাণের খবর বা ছবি পাঠানোর জন্য কোনও জায়গা ছিল না। প্রথম দিকে কিষেণজি এবং অন্য নেতারা তার খবর কোথায় প্রকাশিত হচ্ছে তা রোজই জানার চেষ্টা করতেন। সেই সমস্যার কথা অনির্বাণ একদিন বসকে জানায়। তারপর রাকেশের পরামর্শে একটা সমাধানের রাস্তা বার করা হয়। সেটা কী? এশিয়ান নিউজ ইন্টারন্যাশনালের নাম করে একটি ভুয়ো ওয়েবসাইট খোলা হয়। সেই সাইটে কিষেণজির একের পর এক ইন্টারভিউ প্রকাশিত হতে থাকে। লালগড় আন্দোলন নিয়ে বিভিন্ন খবরও স্থান পেতে থাকে ওয়েবসাইটের দেওয়ালে। মোবাইলের মাধ্যমে বেশ কিছু লিঙ্ক পাঠানো হয় কিষেণজির কাছে। ব্যাস, তাতেই কাজ দেয়। আর ওই একটি জায়গা ঠিক থাকলেই যে কাজ করতে আর অসুবিধা থাকার কথা নয়, তা আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না।

ওয়েবসাইটের পাসওয়ার্ডও দেওয়া ছিল অনির্বাণেরই কাছে। রোজ কাজ সেরে হোটেলে ফিরে এসে সে নিজেরই ওয়েবসাইটে সব আপলোড করে দিত। দু'একদিন দু'একজন তার কাছে দেখতেও চেয়েছিল তার লেখা খবর। তবে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে বেশি সময় লাগেনি। যখনই কেউ সন্দেহ নিয়ে জানতে চেয়েছে তখন নিজের মোবাইলের লিঙ্কে ক্লিক করে খুলে দিয়েছে সেই পেজ। একবার দেখার পর দ্বিতীয় দিন আর কেউ প্রশ্ন করার সুযোগ পায়নি। ছত্রধরও একদিন জানতে চেয়েছিলেন,'আপনাদের তো শুধু লিখতে হয়। এত ছবি তুলে তা হলে কী করেন?' সবার

কৌতূহলের জবাব দিতে ওই ওয়েবসাইটেই ছবি আপলোড করার ব্যবস্থা করা হয় রাতারাতি, যাতে কেউ বিষয়টি সম্পর্কে দ্বিতীয়বার সন্দেহ প্রকাশ না করে।

হোটেলটার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এলাকার বেশ কয়েকটি ছবি তুলল সে। ল্যাপেলটা মুখের সামনে ধরে টেস্ট করেও নিল। দেখা গেল ভালোই কাজ করছে সাউন্ড রেকর্ডারটি। খানিকক্ষণ সেটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে তারপর একটা ব্যাগে ভরে চালান করে দিল খাটের নীচে। যাতে চট করে কারও নজরে না পড়ে। যত চূড়ান্ত সময় এগিয়ে আসছিল একটু একটু করে তখন থেকেই টেনশন বাড়ছিল যেন। চাপ কাটানোর জন্য কানে হেড ফোনটা গুঁজে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দিল। কোনও একটা সময় ঘুমিয়েও পড়ল। ঘুমটা ভাঙল প্রায় সাতটা নাগাদ। তাও হয়ত ভাঙত না। যদি না হোটেলের মালিক বাপী এসে 'রাতে কি খাবেন?' জানতে না চাইত। বাপীর বাজানো কলিং বেলটাই ঘুম ভাঙিয়ে দিল। হুড়মুড় করে ওঠার সময় ভাবল হয়ত তার পার্টনার চলে এসেছে।

'না দাদা, রাতে কিছু খাব না। একজন পরিচিতর বাড়িতে নেমন্তন্ন রয়েছে। সেখানে যেতে হবে।' দরজাটা খুলে প্রথমে খানিকটা থমকে গিয়ে, তারপর নিজেকে সামলে জবাব দিল সে।

এই বাপী ছেলেটি অত্যন্ত ভদ্র। এতবড় একটা হোটেলের মালিক অথচ দেখে বোঝা যায় না। অরিন্দম যে তার হোটেলে নাম ভাঁড়িয়ে অনির্বাণ নামে রয়েছে, জানা নেই বেচারার। হোটেল থেকে জঙ্গলমহলের পুরো এলাকাই সবাই তাকে অনির্বাণ নামেই চেনে। এসটিএফের তৈরি করে দেওয়া নকল আইকার্ডেও সেই নামই লেখা রয়েছে।

টিভিটা চালিয়ে খবরাখবর দেখে, পোশাক পরে বেরতে বেরতে রাত ন'টা বেজে গেল। আন্দোলন আর হামলার আতঙ্কে বছরের অন্যান্য সময় রাত ন'টাই এখানে মধ্যরাত। কিন্তু পুজোর সময় সেই আতঙ্ক ভাবটাই যেন অনেকটা কেটে গিয়েছে। বাইরে এখন প্রচুর লোকজন। তারা সবাই ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছেন। গিফটের প্যাকেটটা হাতে নিয়ে একপা'দুপা করে সে নেমে এল হোটেলের নীচে। রাতের বেলা এই হোটেলের সৌন্দর্যটা আরও বেশি করে যেন বোঝা যায়। একপাশে ঝাড়গ্রাম মহকুমা জেল। রাস্তায় দাঁড়ালেই জেলের ভেতর নানা রকম গাছগাছালি দেখা যায়। হোটেলের বড় গেটটা থেকে একটা টানা রাস্তা সোজা চলে গিয়েছে বাজারের দিকে। সেই রাস্তার দু'পাশে শাল,সেগুন গাছ। ওইসব গাছের ফাঁক দিয়ে একদিকে পুজোর আলো, অন্য দিকে চাঁদের আলো, পরিবেশটাকে যেন আরও বেশি রহস্যময় করে তুলেছিল। জায়গাটার নামও বড় অদ্ভুত, ঘোড়াধরা। সপ্তমীর রাত ফলে বহু মানুষ সেদিন সপরিবারে পুজো দেখতে বেরিয়েছেন। তাদের ভিড়ে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে মিলিয়ে গেল অনির্বাণ।

বাইরে থেকে দেখে বেশ বোঝা যাচ্ছিল একটা জমজমাট আসর বসেছে। বাড়ির বাইরের কাঠের গেটটা খুলে ভিতরে পা রাখতেই দৌড়ে এল বীক্ষণ। 'আরে ভাই, এত দেরি করে এলে হবে? আপনার বউদি খোঁজ করছিল, ছেলে দু'বার জানতে চাইল আঙ্কল এসেছে কিনা? জানেন তো আমরা গ্রামের লোক। তাড়াতাড়ি চলুন আগে খেয়ে নেবেন।' পাল্টা কোনও উত্তর দেওয়ার সুযোগই পেল না অনির্বাণ। হাত ধরে প্রায় জোর করে তাকে বসিয়ে দেওয়া হল খাবারের জায়গায়। জম্পেশ মেনু ছিল

রাতের খাবারে। বহুদিন পর সুস্বাদু রান্না পেয়ে পেটপুরে খেয়ে নিল সে। খাওয়া শেষ হতেই তাকে নিজের ঘরে নিয়ে গেলেন বীক্ষণ। দীর্ঘদিন ধরে যাতায়াতের সুবাদে ওই পরিবারের সবাই তাকে চেনে। কাজেই বীক্ষণের ছেলের হাতে গিফটের প্যাকেটটা তুলে দিয়ে ঘরের আশেপাশে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। অত রাতেও বহু অচেনা মানুষের মুখ দেখা গেল ওই অনুষ্ঠান বাড়িতে। এদের মধ্যে কয়েকটা মুখ দেখা গেল বেশ সন্দেহজনক। তাদের মধ্যে কয়েকজনকে বিভিন্ন সময়ে লালগড় এবং বেলপাহাড়িতে কমিটির মিটিং-মিছিলে দেখেছে অনির্বাণ। ঘণ্টাখানেক সেখানে কাটিয়ে বেরিয়ে আসার পর মনে হল, আজ কি তবে সব নিমন্ত্রিত বাড়ি ফিরবেন না? নাহলে, ওই অতদূরের সব জায়গায় ফিরবেন কী করে? সেসব প্রশ্নের উত্তর অবশ্য তার পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না।

রাত তখন প্রায় সাড়ে এগারোটা। অথচ রাস্তায় বহু মানুষের ভিড়। তাদের বেশির ভাগই ঠাকুর দেখে নিজের বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এসব দেখে নিজের গ্রামের বাড়ির কথাই যেন মনে পড়ে গেল তার। আজও হয়ত গ্রামের বন্ধুরা চণ্ডীমন্ডপে ছোটবেলার মতো আনন্দ করছে। আর তাকে ঘড়বাড়ি ছেড়ে পড়ে থাকতে হচ্ছে এমন একটা জায়গায় যেখানে আনন্দ করার চেয়ে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখার তাগিদ অনেক বেশি।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে একটা সময় পৌছে গেল হোটেলে। ওই বাড়ি থেকে হোটেলটা বেশি দূর নয়। মিনিট দশেকের রাস্তা। আজ আবার একটু বেশি রাত পর্যন্ত জেগে থাকতে হবে। তাকে সাহায্য করতে কাকে পাঠানো হবে কে জানে? ঘরে ফেরার পর মনটা শান্ত রাখার চেষ্টা করলেও তা যে আর হওয়ার নয় সেটা বেশ বুঝতে পারছিল। আজ রাতে আর খাওয়াদাওয়ার চক্কর নেই। তাই ফ্রেশ হয়ে একটা জম্পেশ সিনেমা দেখতে বসল টিভিতে। রাত বাড়তে থাকল। বারোটা, একটা। এবার প্রায় অধৈর্য লাগছিল। কখন আসবে রে বাবা! তাছাড়া এতরাতে আসাও তো রিস্কের ব্যাপার। কে, কোথায়, কী করে বসে কেউ জানে না। একটা এতবড় কাজ করতে চলেছে কাল। আর আজ কি না তার সঙ্গী আসছে প্রায় মাঝরাতে। বিরক্তিকর ব্যাপার-স্যাপার।

রাত তখন দু'টো। সিনেমার ভিলেন ততক্ষণে নায়কের হাতে রক্তাক্ত। নীচের গেটে যেন একটা আওয়াজ পাওয়া গেল? কানটা সতর্ক হয়ে ওঠায় ধড়ফড় করে অন্ধকার বারান্দায় এসে দাঁড়াল সে। ওপর থেকে পরিষ্কার দেখা গেল বাইরের তালা দেওয়া বন্ধ গেটটা ধাক্কা দিচ্ছে কেউ একজন। হাতে একটা বড় ব্যাগ, একটা ব্যাগ ঘাড়ে। হুড়মুড় করে সিঁড়ি দিয়ে নীচের তলায় রিসেপশনের কাছটায় এসে দেখা গেল সামনে মেঝেতে চাদর পেতে ঘুমিয়ে পড়েছেন কয়েকজন হোটেল কর্মী। যদিও তাদের আগেই বলে রাখা হয়েছিল আরও একজন আসবেন, কিন্তু তার যে এত রাত হবে সেটা জানা ছিল না, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। ঠেলেঠুলে একজনকে তোলা গেল। বড় দরজার চাবি খোলার পর ভেতরে এলেন যিনি, তাঁকে তো ভালো ভাবেই চেনে অনির্বাণ। এই মিশন কমপ্লিট করার আগে লালবাজারে তাদের যে ওয়ার্কশপ হয়েছিল সেখানে রাঘব দাস ছিলেন। তিনি আসলে কলকাতা পুলিশের একজন কমান্ডো। তবে সিনিয়র। সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মুখে কিছু না বললেও ঘরের ভেতরে ঢোকার পর ক্ষুব্ধ রাঘব মুখ খুললেন, 'তোমাকে তো অন্তত দশবার ফোন

করলাম, কিন্তু লাইনই ঢুকল না। এইটুকু রাস্তা এতরাতে আসতে কত পরিশ্রম করতে হল জানো? ফোনটাতো ঠিক রাখা উচিত।'

'আরে ফোন তো আমার পকেটেই রাখা আছে, সম্ভবত লাইনটা ঢোকেনি।' শান্ত ভাবেই জবাব দিল অনির্বাণ।

'কে বলল করিনি। নিজের মোবাইলটা দেখো। XXXXXX নম্বরে টানা ফোন করে গেলাম কিন্তু একেকবার একেকরকম কথা বলছে।' আবারও অনুযোগ রাঘবের।

'মানে? আপনাকে ওই নম্বরটা কে দিল? ওটা তো আমার কাছে নেই'—উত্তরটা দিয়েই দৌড়ে বাথরুমে ঢুকে পড়ল সে। একদম ভুলে গিয়েছিল বাকি সিমগুলি-সহ আরও দুটি ফোন প্লাস্টিকে মোড়া অবস্থায় রাখা আছে কমোডের সিস্টার্নে। বাইরে বেরনোর সময় অত ফোন নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে সেগুলি একসঙ্গে মুড়ে রাখা হয়েছিল এমন একটা জায়গায় যাতে কারও সন্দেহ না হয়। এমনকী, ফ্ল্যাশ করলেও জলে না ভিজে যায়। আর ওখানে রাখা প্যাকেটেই রয়েছে সেই সিম কার্ডটি, যে নম্বরটিতে ফোন করে বন্ধ পেয়েছেন ওই কমান্ডো অফিসার। ঘর পরিষ্কার করার নামে হোটেলের বয়রা বোর্ডার না থাকলেও ঘরে ঢুকে পড়ে, মূলত তাদের নজরের বাইরে রাখার জন্য এই পদ্ধতি অনির্বাণের কাছে সঠিক বলে মনে হয়েছিল।

এবার নিজের ব্যাগ খুললেন রাঘব। ওই ব্যাগে রাখা ছিল দু'টো পিস্তল আর কয়েকটি মাইক্রো জিপিএস(গ্লোবাল পজিশনিং সিস্টেম) ডিভাইস। সাধারণ বোতাম বা পেনের মতো দেখতে, যেগুলো অন করলেই কন্ট্রোল রুমে জানিয়ে দেবে দুই অফিসারের সঠিক অবস্থান। সেগুলি চার্জে বসিয়ে দেওয়া হল সঙ্গে সঙ্গে। অনির্বাণ এবার রাঘবের কাছে পুরো প্ল্যানটি বুঝিয়ে বলল। ওপারে ফোন অন রেখে বিষয়টি বিস্তারিত শুনলেন রাকেশ। তিনি সামান্য কিছু অদলবদল করে দিলেন। কিন্তু রাঘব শুরুতেই জানালেন, তিনি ক্যামেরা পুরোপুরি চালাতে জানেন না। একদম শেষ মুহূর্তে এরকম নেতিবাচক মানসিকতায় রাগ হলো অনির্বাণের। এত সিনিয়র লোক অথচ সামান্য জ্ঞানটুকু নেই।

ঘরে ঢুকে মধ্যরাতে হু-হা করে ডন দেওয়া শুরু করেছে। মাথাঠান্ডা রেখে ঝামেলা না বাড়িয়ে নিজের ব্যাগ থেকে পিডি-১৭৫ ক্যামেরাটা বার করে অনির্বাণ পাখি পড়ানোর মতো বুঝিয়ে দিল সব কিছু। সামনে কাল্পনিক ছত্রধরকে ভেবে একটা ছোটখাট অভিনয় পর্যন্ত করে ফেলল তারা। সারারাত এসব করতে গিয়ে ঘুম হল না। দফায় দফায় আলোচনা এবং সম্ভাব্য নির্মাণ করতে করতে রাত কেটে ভোর হয়ে গেল। তবে, এত কাজের এনার্জি পাওয়া গেল বুদ্ধি করে ফ্লাস্ক ভর্তি গরম কফি আগে থেকেই ঘরে মজুত করে রাখায়।

সিনিয়র সহকর্মীকে হাতে কলমে কাজ শেখাতে গিয়ে নিজেকে ট্রেনার বলে মনে হচ্ছিল তার। একটা সময় অধৈর্য হয়ে রাঘবও বলেই ফেলল, 'তুমি তো শুধু পুলিশ নও দেখছি, একেবারে টেলিভিশন নিউজের পাণিনি।' কথাটা তির্যক ভাবে বলা হলেও কাজের কথা মাথায় রেখে পুরোটাই হজম করে নিল সে। কিছু জিনিস অবশ্য হজম করে নিতেই হয়। কারণ, রাঘব অন্তত ৮ ব্যাচ সিনিয়র তার থেকে। অথচ অনির্বাণ এই অপারেশনের কমান্ডিং অফিসার। রাতে ক্যামেরা চালানো

শেখাতে গিয়ে রাঘবের সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ উঠে এল, কথা বলতে গিয়ে একটা নতুন তথ্যও জানতে পারল সে। আগের দু'বার অপারেশনের তারিখ কেন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছিল তা এখানে বসে জানা সম্ভব হচ্ছিল না তার পক্ষে। এখন অনেকটাই পরিষ্কার হল। সেটা খোলসা করল রাঘব। ঘটনাটা হল, অনির্বাণের ব্যাকআপ ফোর্স হিসেবে কাজ করার জন্য যাদের তৈরি করা হচ্ছিল সেই কমান্ডো অফিসারদের আগাম প্রস্তুতি হিসেবে পুজোর কলকাতার ভিড়ে মকড্রিল করানো হচ্ছিল। পুলিশ কর্তারা মনে করছিলেন, যদি কোনও কারণ ছাড়াই অ্যারেস্টিং পার্টি গ্রামবাসীদের প্রতিরোধের মুখে পড়ে তাহলে তাদের উদ্ধার করা হবে কীভাবে তার প্রশিক্ষণ নেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেটা দিতে দিতেই কেটে যায় চতুর্থী, পঞ্চমী এবং ষষ্ঠী। ফলে সেই ফোর্সকে ঠিক ভাবে তৈরি করতে না পারার কারণেই পিছিয়ে দিতে হয়েছে মিশনের তারিখ এবং সময়। বিষয়টা জেনে হাসি পেল তার। তাহলে এরকমও হয়!

সারারাত প্রস্তুতির পিছনে ব্যয় করার পর ভোরবেলা স্নান করে চা আসার অপেক্ষা করতে লাগল উত্তজনায় টগবগ করে ফুটতে থাকা দুই অফিসার। টেনশন কাটাতে এদিক-ওদিক ফোন ঘোরানো শুরু করলেন তারা। খানিকক্ষণ বাদেই কলিংবেলটা হঠাৎ বেজে উঠল। একমুখ হাসি নিয়ে হোটেল বয় শম্ভু ব্রেকফাস্টের প্লেট নিয়ে ঢুকল ঘরে। অত সকালে তৈরি হয়ে গিয়েছিল গরম লুচি, আলুর দম সঙ্গে বাড়তি পাওনা একটা করে মিষ্টি। অন্য কেউ ঘরে এলে অসুবিধা হত। শম্ভু ছেলেটা ভালো। আশপাশে কী হচ্ছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র কোনও আগ্রহ নেই তার। প্লেটগুলি টেবিলের ওপর রেখে শম্ভু ফের হাসিমুখে জানতে চাইল, 'আজ তো অষ্টমী, দুপুরে দেশি মুরগির মাংস কি খাবেন?'

—'না, না,ভাই, আমরা বরঞ্চ আজ বাইরেই খেয়ে নেব।' প্রায় এক সঙ্গে বলে উঠল দু'জনে।

'আচ্ছা ঠিক আছে।' শম্ভু দ্রুত বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

খাবারটা কোনওক্রমে মুখে গুঁজে অনির্বাণ ফোন করল বীক্ষণের নম্বরে। 'গুড মর্নিং দাদা, খবর কী? আজ ছত্রধরের ইন্টারভিউটা করতেই হবে। অফিস লাস্ট ওয়ার্নিং দিয়েছে। আপনি একমাত্র পারেন এটা করাতে। না হলে এই ভাইয়ের চাকরিটাই থাকবে না। প্লিজ দাদা, এবারের মতো আমাকে বাঁচান।'

ওপার থেকে ভেসে এল, 'ওসব নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। আজ হয়ে যাবে। ছত্রকে বলছি ইন্টারভিউ দেওয়ার জন্য। ওকে ফোন করছি। দেখে নিচ্ছি ও কোথায় আছে।'

অপেক্ষা শুরু হল।

ফের দশ মিনিট বাদে বীক্ষণের ফোন- 'শুনুন। ছত্রর ফোনটা বন্ধ। তাছাড়া একটা খবর পেলাম জামবেড়ার কাছে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটি অনশন শুরু করেছে। ওখানে আগে যাই। তারপর সেখান থেকে স্থানীয় নেতাদের ধরে ঠিক ছত্রর কাছে পৌছে যেতে পারব। আমি কাজু সিংকে বাইকটা নিয়ে আমার বাড়িতে আসতে বলেছি। আপনিও চলে আসতে পারেন।'

—' না দাদা, আজ আমার অফিস থেকে এক ক্যামেরাম্যানকে পাঠানো হয়েছে। সে আবার সঙ্গে যাবে। আমার তোলা ছবিতে নাকি অফিস খুশি নয়। আমাদের আরও একটা বাইক প্রয়োজন।' এপাশ থেকে উত্তর গেল।

বীক্ষণ তখন উদ্ধারকর্তার ভূমিকায়। 'ঠিক আছে। সমস্যা নেই। আমি সাংবাদিক বন্ধনকে ডেকে নিচ্ছি। তেল ভরে নিয়ে ওর বাইকে আপনারা চলে যেতে পারবেন।'

—'ঠিক আছে দাদা, আপনার এই ঋণ জীবনে শোধ করতে পারব না।'

ক্যামেরার ব্যাগটা ঘাড়ে নিল অনির্বাণই। কেউ না জানলেও শুধু ওরা দু'জন জানে, ওই ব্যাগেই রাখা অপারেশনের আসল জিয়নকাঠি। দু'জনের শরীরে সেট করা জিপিএস। হোটেল থেকে বেরিয়ে হেলতে দুলতে তারা হাজির হল ঝাড়গ্রাম পাঁচ মাথার মোড়ে। ছোট্ট শহরটা ততক্ষণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে। রওনা হওয়ার ঠিক আগে বস বারবার বলে দিয়েছিলেন, 'মাথা ঠান্ডা রাখতে হবে বরফের মতো, তা পরিস্থিতি যাই হোক না কেন। আর টেনশন ফ্রি হয়ে কাজ করো। এবার যদি না হয় তাহলেও চাপ নেই। মাথায় রাখবে কাজটা ভবিষ্যতেও করা যেতে পারে। তাই কোনও রকম বাড়তি ঝুঁকি নেবে না।'

সকাল ন'টা। সেই ডিংডং বুথের পাশের গলির ভিতর থেকে একটা বাইকের পিছনে বসে এগিয়ে আসতে দেখা গেল বীক্ষণকে। বাইকটা চালাচ্ছিল কালো মতো স্বাস্থ্যবান একটা ছেলে। একে অনেকবার দেখেছে অনির্বাণ। সম্ভবত সেই কাজু, আজতক চ্যানেলে স্থানীয় ক্যামেরাম্যান হিসেবে ছবি তোলে ছেলেটি। অনির্বাণ তার সঙ্গী রাঘবকে নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল বীক্ষণের বাড়ির দিকে। কিন্তু রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল ওদের। প্রথম বাইকটার পিছনে নজরে এল আরও একটা বাইক। সেটাতে রোগা মতো চেহারার বন্ধন। কাজু যে বাইকটি চালাচ্ছিল সেখানে বসল রাঘব। পাশের বাইকে চাপল অনির্বাণ।

বাইক এগিয়ে চলল পাকা রাস্তা ছাড়িয়ে লালমাটির দিকে। যেতে যেতেই ফোনে খবর এসেছিল জামদাতে পথ অবরোধ করা হচ্ছে। আন্দোলনের ফলে সব রাস্তা ফাঁকা। খুব জরুরি কাজ না থাকলে কেউ বাইরে বেরতে চান না। একটা আতঙ্ক প্রতি মুহূর্তে সবাইকে যেন তটস্থ করে রেখেছে। রাস্তা দিয়ে যাওয়াও বিপজ্জনক। কোথায় ল্যান্ডমাইন পাতা রয়েছে কেউ জানে না। পদে পদে মৃত্যুর আতঙ্ক নিয়ে শুধু সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিরা ঘোরাঘুরি করেন এদিক-ওদিক। দীর্ঘ পথ, ফলে পরিবেশ-পরিস্থিতি বুঝে বেশ লম্বা-চওড়া একটা লেকচার শুরু করলেন বীক্ষণ। ওটা তাঁর পছন্দের বিষয়। দহিজুঁড়ি মোড় পেড়িয়ে বেলাটিকড়ির দিকে গাড়িটা ঘোরাতে বললেন তিনি। যুক্তি দিলেন, গরমের দিন তাই কাঁসাই নদীতে জল থাকবে না। ফলে জামবেড়ার কাজ করে লালগড় ঢুকে পড়তেও বেশি সময় লাগার কথা নয়।

৪৫ মিনিটের মধ্যে দু'টো বাইক পর পর পৌছে গেল সেখানে, যেখানে আন্দোলন চলছে। রাস্তায় পোস্টার বিছিয়ে যৌথ বাহিনী প্রত্যাহারের দাবিতে পথ অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সাংবাদিক দেখে তারা আরও উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। বীক্ষণ এগিয়ে গিয়ে কথা বলতেই দেখা গেল

আন্দোলনকারীরা অনেকটা শান্ত হয়ে গিয়েছেন। যাঁর নেতৃত্বে পথ অবরোধ চলছিল, সেই জনসাধারণের কমিটির স্থানীয় নেতা সামনে এলেন। তড়িঘড়ি বাইক থেকে নেমে রাঘব ক্যামেরা বার করতেই ল্যাপেল হাতে নিয়ে হাজির অনির্বাণ। এবং তা জামাতে ক্লিপ দিয়ে আটকে শুরু হল প্রশ্ন। প্রায় পনেরো মিনিট ধরে বাইট (বক্তব্য) নেওয়ার পর ছবি তুলতে খানিকটা সময় লাগল। ঘটনাস্থলের নানান অ্যাঙ্গেলের ছবি তুলতে নিজের ক্যামেরাম্যানকে সাহায্য করল সাংবাদিক অনির্বাণ । এসব দেখেশুনে মন্তব্য করল বীক্ষণ, 'দেখ কাজু, একে বলে বিদেশী চ্যানেলে ছবি তোলা। তোরা এসব অ্যাঙ্গেল তো ভাবতেই পারবি না।' কাজু মুখ থেকে গুটখা ফেলতে ফেলতে জবাব দিল, 'আরে,ওটা দামি ক্যামেরা। আর আমারটা কম দামি। পার্থক্য তো হবেই।'

দু'জনের কথার ফাঁকে সেখানকার কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। বন্ধন তাড়া দিল, 'চলুন এবার লালগড়ের দিকে যাই।' সবাই রওনা দেওয়ার জন্য রেডি হওয়ার মুখেই চোখ পড়ল একটা চায়ের দোকান একটু দূরেই খোলা রয়েছে। বাঙালি আড্ডা আর চা পেলে অনেক কিছুই ভুলে যেতে পারে। কাজেই সবাই একমত হল একবার একটু চা খেয়ে নেওয়া যাক। বীক্ষণ হাঁক পাড়ল, 'এই চালু চা নয়, বানিয়ে ভালো পাঁচটা চা দে।' দেখা গেল দোকানদার তাঁর পরিচিত। সে একগাল হেসে জবাব দিল, 'আজকাল আপনাকে তো আর দেখতে পাই না। কোথায় থাকেন?' সামান্য চাওয়ালা, তাই সম্ভবত ইগোতে লাগল বীক্ষণের। পাত্তা দিল না কথাটায়।

সবাই মিলে রাস্তার ধারে বাইক দাঁড় করিয়ে গল্প শুরু করতেই চা চলে এল দ্রুত। আচমকা মোবাইটা কর্কশ শব্দ তুলে বেজে উঠল অনির্বাণের পকেটে। ফোনটা বার করেই গলার স্বরটা একেবারে খাদে নামিয়ে অনির্বাণ সবার সামনেই বলে উঠল, 'বাবা, সকাল থেকে বেরিয়েছি। দেখো না আজ ছোট্টর সঙ্গে দেখা হওয়ার কথা, কিন্তু এখনও যোগাযোগ করতে পারিনি। এখানে গুণধরবাবু (বীক্ষণের কোড নেম) আছেন আমাদের সঙ্গে। তিনি কথা দিয়েছেন আজ ইন্টারভিউ করিয়ে দেবেন। ওদিকে অফিসও খুব তাড়া দিচ্ছে। তবে আমি সফল হবই। আর হ্যাঁ, এরপর লালগড়ের দিকে যাব আমরা। তবে তুমি চিন্তা কোরো না। টাইমে টাইমে সব জানাতে থাকব।'

ফোনটা রেখে বীক্ষণের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর বলবেন না। বাবা সব ব্যাপারেই এত চিন্তা করে। যখন শুনেছে ছত্রধরের ইন্টারভিউ না করতে পারলে চাকরিটা চলে যাবে, তখন থেকে বারবার ফোন করছে। শুনলেন তো, আমি বলে দিলাম আপনি আছেন তাই চিন্তা নেই। বাবা অবশ্য আপনাকে গুণধরবাবু বলেই চেনেন। আসল নামটাও জানেন না।'



প্রাণ খুলে হা, হা করতে হাসতে দেখা গেল বীক্ষণকে। তাতে যোগ দিল কাজু আর বন্ধনও। ‘চলুন তাহলে এগিয়ে যাওয়া যাক।’ প্রস্তাব দিল কাজু। ফের সবাই বাইকে চড়ে রওনা দিল লালগড়ের পথে। নদী পেরিয়ে ওপারে যেতেই নজরে এল অন্যান্য দিনের তুলনায় পুলিশের তৎপরতা একটু যেন বেশি। মনে হল, আশপাশে কোনও মেলা হচ্ছে। না হলে এত বরফওয়ালা, বেলুনওয়ালাদের ভিড় কেন পুরো এলাকা জুড়ে? এখানেও বিশেষজ্ঞের ভূমিকায় বীক্ষণ। ‘অষ্টমীর দিন মেলা বসে এখানে, সেই কবে থেকে? আগে কয়েক হাজার লোক খেত। আমি কতবার ঝুমুর গান গেয়েছি পাশের মাঠে। তোরা সব আজকের ছানা (ছোট ছেলে), কী জানিস এসবের?’

কেউ কিছু বলল না। বন্ধন একবার শুধু মুখ খুলল, ‘দাদা, বউদির দোকানে দুপুরের খাওয়াটা খেয়ে নিলে হত না? পরে দেরি হয়ে যাবে।’ অনির্বাণের ইচ্ছে ছিল না। কিন্তু বাদবাকি সবাই রাজি হওয়াতে তার আর আপত্তি জানানোর সুযোগ ছিল না। বাইকগুলিকে বাজারের রাস্তার ওপর দাঁড় করিয়ে সবাই ঢুকে পড়ল হোটেলে। সদাহাস্যময়ী বউদি তাদের দেখে বললেন, ‘আজ সবাই প্রসাদ খেয়ে নিচ্ছে। তাই লোকজন আসছে না। আপনারাই এলেন। বলুন কী খাবেন? ডিম দেব? ভালো শাক ভাজা করেছি।’

‘যা হয় দিন না। খিদে পেয়েছে। ডিমই দিন।’ আবার সেই বীক্ষণ।

সেপ্টেম্বর মাস হলেও জঙ্গলমহলের বিভিন্ন জায়গায় গরম কমেনি। খদ্দেরদের মন জয় করতে বউদি ঘর থেকে একটা টেবিল ফ্যান এনে চালিয়ে দিলেন। প্রবল আওয়াজ করে ফ্যানটা চলতে শুরু করল। পুরো পরিবেশটা অসহ্য লাগলেও অনির্বাণ এটা ভেবে আনন্দ হল যে আপাতত কিছুক্ষণ বীক্ষণের লেকচার শুনতে হবে না। কিন্তু ভুল ভাবল সে। ফ্যানের এই শব্দ করে ঘোরা নিয়েও নিজের জ্ঞান বিতরণ করার সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইল না বীক্ষণ।

খাওয়া শেষ হতেই অনির্বাণ বলল, ‘আমি টাকাটা পেমেন্ট করি। আজ অষ্টমী। এটা অন্তত আমাকে দিতে দিন।’ কেউ খুব একটা আপত্তি করল না।

বাইরে বেরিয়ে কাজু বাদে সবাই সিগারেট ধরিয়ে লম্বা টান দেওয়া শুরু করল। ফের বেজে উঠল অনির্বাণের মোবাইল। বোতামটা টিপে সে কথা বলা শুরু করল, ‘বাবা, আমরা এখন লালগড় বাজারে। গুণধরবাবু আমাদের সঙ্গেই আছেন। চিন্তা কোরো না। আজ কাজটা কমপ্লিট করে ফেলতে পারব। এবার ছত্রর ইন্টারভিউয়ের জন্য যাব আমরা।’

ফোনটা রেখেই অনির্বাণ মুখটা কাঁচুমাচু করে ফেলল। ‘দাদা, দেখলেন তো বাবা পর্যন্ত চিন্তা করছেন। আজ ইন্টারভিউটা না করতে পারলে চাকরিটা থাকবে না।’

কথাটা শুনে পকেট থেকে নিজের মোবাইল ফোনটা বার করে আনলেন বীক্ষণ। তারপর ফোন ঘোরালেন ছত্রর নম্বরে। রিং হতে হতে কেটে গেল প্রথম নম্বরটা। এত সহজে দমার পাত্র নন তিনি। দ্বিতীয় নম্বরটাও মেলালেন নিজের ফোনে। কিন্তু সেটাও বন্ধ। এবার খেপে গেলেন, ‘বিরাট দেড়চালাক হয়ে গিয়েছে এখন। কিষেণজিকে বলতে হবে ওর নামে।’

আরও প্রায় আধঘণ্টা দাঁড়িয়ে থেকেও ফোনে ধরা গেল না ছত্রধরকে। বীক্ষণ এবার প্রস্তাব দিলেন, 'চলুন, আমরা নেতাইয়ের দিক দিয়ে যাই। আগে একদিন ওখানে পেয়েছিলাম।' সবাই মিলে সেখান দিয়ে ঢুকতে গিয়ে দেখা গেল চারিদিকে প্রচুর পুলিশ। 'না,এখান দিয়ে আজ হবে না। পুরো এলাকা যৌথ বাহিনী প্রায় ঘিরে রেখেছে।' বীক্ষণের সতর্কবার্তায় ফের পিছিয়ে আসা হল। তাহলে কী করা হবে? 'ফিরে যাব আমরা? রাতে আবার ঠাকুর দেখতে বেরতে হবে।' একটা পান মুখে দিয়ে নিজের ইচ্ছের কথা জানাল বন্ধন।

অসহায়ের মতো মুখটা করে অনির্বাণ বলে উঠল, 'আর কী বলব? কাল হয়ত অফিস আমাকে কলকাতায় ডেকে নেবে। বলবে আর চাকরিটা পার্মানেন্ট হবে না। পারলাম না আমি। হেরে গেলাম।' চোখটা ছলছল করে উঠল তার।

আবার নিজের মোবাইলটা পকেট থেকে বার করে বীক্ষণ ফোন করার চেষ্টা করলেন। ওপারের ফোন অবশ্য তখনও বন্ধ। রাগে গজগজ করতে লাগলেন তিনি।

এবার যেন নতুন কিছু আবিষ্কার করার মতো পকেট থেকে মোবাইল বার করে আনল কাজু। 'দাদা, আমার কাছে ছত্রর একটা নতুন নম্বর আছে, ফোন লাগাবো?' গলার স্বরটা রহস্যময় করে প্রশ্ন করল সে।

'আরে কর না। কে না করল তোকে।' তাচ্ছিল্য সহকারে বলল বীক্ষণ।

একটা নম্বরে ফোন করেই ফেলল কাজু। রিং হওয়া শুরু হল ওই নম্বরে।

একবার, দু'বার, তিনবার রিং হয়েই যাচ্ছে ফোনটা।

উৎকণ্ঠায় যেন আর দাঁড়িয়ে থাকতে পারছিল না অনির্বাণ। রাঘবের অবশ্য সেসবে হুশ নেই। সে দিব্যি লম্বা একটা সিগারেটে টান দিয়ে চলছিল।

'যাঃ। কেটেই গেল ফোনের লাইনটা।' হতাশ হয়ে পড়ল কাজু। মুখে অবশ্য বলল, 'দাঁড়ান আরও একবার চেষ্টা করে দেখি।'

এবার নম্বরটা ডায়াল করে স্পিকার অন করে দিল সে।

আবার সেই ফোন বাজার খেলা। একটা সময় অত্যন্ত বিরক্ত লাগছিল সবার। এক, দুই, তিন করে কাটছিল প্রতিটা সেকেন্ড। ঘড়িতে চোখ রেখে দেখল বেলা দেড়টা বেজে গিয়েছে।

হঠাৎ।

প্রায় লাস্ট রিংয়ের কাছাকাছি যেতে 'হ্যালো' বললেন একজন। কাজু ততক্ষণে উত্তেজনায় যেন কাঁপতে শুরু করেছে। সবাইকে শুনিয়ে চিৎকার করে জানতে চাইল সে, 'ছত্রদা, আমি কাজু। তুমি কোথায়? কতক্ষণ ধরে তোমাকে সবাই মিলে খুঁজছি জানো?' ততোধিক ঠান্ডা গলা ওপারে থাকা ব্যক্তির।

'তাই নাকি? আমি তো লালগড়ের দিকেই আছি।' বোঝা গেল, যাকে কার্যত গোরু খোঁজার মতো খোঁজা হচ্ছে, তিনি নিজের এলাকাতেই বহাল তবিয়তে রয়েছেন।

কাজু ভুলে গেল ফোনটা স্পিকারে দেওয়া রয়েছে। ফের চেঁচিয়ে জানতে চাইল, 'আরে কোথায় আছো সেটা তো বলো? আমরা যাব।'

ছত্র জবাব দিল, 'চলো আসো। আমি বীড়কাঁড়ে রয়েছি।'

আর এক মিনিটও দাঁড়ানোর মানে হয় না। সবাই বাইক ছুটিয়ে ঢুকে পড়ল লালগড়ে। তীরের গতিতে পৌছে গেল বীড়কাঁড় স্কুলের কাছে। সেখানে ঢোকার পথে দেখা হল ছত্রধরের অন্যতম সহযোগী মনোজ মাহাতোর সঙ্গে। একটা পায়ে সমস্যা থাকায় এলাকায় সবাই যাকে ল্যাড়া মনোজ বলেই একডাকে চেনে।

'অ্যাই মনোজ, ছত্রধর কোথায় রে?' বাইকে বসেই জানতে চাইল বীক্ষণ।

'ওই দিকে। আচ্ছা আজ এত পুলিশ কেন চারিদিকে?' পাল্টা প্রশ্ন করল মনোজ।

এবার অনির্বাণ বলে উঠল, 'পুজো তো কাজ নেই, তাই ঘুরছে।'

পাকা রাস্তা ছেড়ে দু'টি বাইক ধরল লালমাটির পথ। খানিকটা এগিয়ে গিয়ে কাজু আবারও ফোন করল ছত্রধরকে। 'আমরা চলে এসেছি। তুমি কোথায়?'

—'তোমাদের দেখতে পাচ্ছি। ওখানেই দাঁড়াও।' আশ্বস্ত করলেন জনসাধারণের কমিটির নেতা ছত্রধর মাহাতো।

পনেরো মিনিটের একটা অপেক্ষা। সেটাই অনন্তকালের বলে মনে হচ্ছিল তখন। ফের যেন ঘড়ির সেই টিকটিক।

এক, দুই,তিন,চার।

অপেক্ষা যখন প্রায় অসন্তুষ্ট করে তুলছে, ঠিক তখনই যেন আশার আলো দেখা গেল। একটা ঢলঢলে ফুলপ্যান্ট এবং তারও চেয়েও ঢোলা জামা পড়ে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে আসতে দেখা গেল ছত্রধরকে। নিজেকে যেন উত্তেজনায় ঠিক রাখতে পারছিল না অনির্বাণ। কারণ, এবার চ্যালেঞ্জটা আরও কঠিন। নিজে কাজ করতে হবে। পাশাপাশি চাপমুক্ত রাখতে হবে পার্টনারকেও। ঠিকঠাক টিমওয়ার্ক না হলে এতদিনের পরিশ্রম সব জলে যাবে। তার চেয়েও বড় কথা প্রাণ নিয়ে ফেরা মুশকিল হবে।

ছত্রধর কাছে এসে কাজুকে দেখে বললেন, 'বড় মাতব্বর হয়েছিস দেখছি। ফোনে অত চেঁচামেচি করছিলি কেন?'

অনেকক্ষণ মুখ বন্ধ করে রাখা বীক্ষণের যেন দমবন্ধ হয়ে আসছিল। এবার তিনি ছত্রধরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'মাতব্বর তো তুমিও হে। আমি ফোন করলাম ধরলে না। যাই হোক এই দাদাদের কিছু প্রশ্ন আছে। একটু তাড়াতাড়ি করতে হবে।'

রাঘব ব্যাগটা খুলে বড় ক্যামেরাটা বার করল। অনির্বাণ ল্যাপেলের তারটা ছত্রধরের জামার ভিতর দিয়ে ঢুকিয়ে বুকের কাছে ক্লিপ দিয়ে আটকে দেওয়ার কাজটা করল। সামনে একটা ছোট ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে গেল কাজু। হাতে বুম (মাইক) ছত্রধরের মুখের সামনে ধরল বন্ধন। অন্যদিন এইসব

সময়ে ছত্রের সঙ্গে থাকেন সর্বক্ষণের সঙ্গী শ্যামল মাহাতো। সেদিন ঠিক ওই সময়ে তিনি গিয়েছিলেন পাকা রাস্তার উল্টোদিকে আমলিয়া গ্রামে, কোনও একটা কাজে।

শুরু হল প্রশ্ন করা।

বীক্ষণ একাই প্রায় পাঁচটি প্রশ্ন করলেন। তারপর বন্ধন। একদম শেষে টার্ম এল অনির্বাণের। যদিও অত্যন্ত মামুলি কিছু প্রশ্ন করল সে।

পাশে দাঁড়িয়ে বন্ধন পরিষ্কার দেখতে পেল, এতক্ষণ প্রশ্নের পিছনে যা সময় গিয়েছে তাতে ক্যামেরা ধরে থাকা হাত কাঁপা শুরু করেছে রাঘবের। তাঁর মনে হল, একজন ক্যামেরাম্যানের তো হাত কাঁপার কথা নয়। তাহলে কি এই ভদ্রলোক পেশাদার নন? প্রশ্নটা সে করতে যাবে। আচমকা পাল্টে গেল পরিবেশ আর পরিস্থিতি।

ল্যাপেলটা ছত্রধরের জামা থেকে খুলতে গিয়ে ততক্ষণে ছ'ফুট উচ্চতার অনির্বাণ বাঁ হাত দিয়ে পেঁচিয়ে ধরেছেন পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনসাধারণের কমিটির মুখপাত্র ছত্রধর মাহাতোর ঘাড়। আর প্রায় চিতা বাঘের ক্ষিপ্রতায় সেই অপটু ক্যামেরাম্যান নিজের ক্যামেরা ব্যাগের প্যাডিং থেকে বার করে এনেছেন একটা ৯ এমএম। অনির্বাণও নিজস্ব রিফ্লেক্সে হাতে তুলে নিয়েছে অন্য পিস্তলটি। যা মুহূর্তের মধ্যে ধরা হয়েছে ছত্রধরের মাথায়।

'এ কী করছেন, এ কী করছেন' শুধু এই ক'টি শব্দ শোনা গেল থতমত খেয়ে যাওয়া ছত্রধর মাহাতোর মুখে।

ততক্ষণে মুখচোখের চেহারাই পাল্টে গিয়েছে অনির্বাণ আর রাঘবের। শরীর থেকে ঠিকরে বেরচ্ছে পুলিশি মাস্তানি।

ওই পরিস্থিতিতে ক্যাবলা বনে যাওয়া বীক্ষণ আর বন্ধনের মুখে ভয় আর বিস্ময় মিলেমিশে একাকার। তবুও বীক্ষণ জানতে চাইলেন, 'আপনারা কি পুলিশ?'

'চোপ শালা। বেশি কথা বললে গুলি চালিয়ে দেব। আমরা পুলিশের বাপ। ফোট এখান থেকে।' কর্কশ গলা অনির্বাণের।

'আমাদের ঠকানো হয়েছে' বলতে বলতে প্রায় হামাগুড়ি দেওয়ার ভঙ্গিতে রাস্তা, ধানখেত পেরিয়ে প্রাণ ভয়ে ছুটে পালালেন বীক্ষণ, বন্ধন আর কাজু। সদর রাস্তার দিকে। ওখানেই দাঁড় করানো রয়েছে তাদের বাইক।

এদিকে, কার্যত অসহায় ছত্রধর দু'হাত তুলে বারবার বলছেন, 'আমাকে মারবেন না। নিয়ে চলুন।'

ছত্রকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হল। অনির্বাণ কমান্ড দিল, 'টেক বডি পজিশন।' মানে, দু'জন দু'জনের পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে যাবেন।

পরিকল্পনা অনুযায়ী, তাদের জিপিএস সিগন্যাল দেখে ততক্ষণে ঘটনাস্থলে পৌছে যাওয়ার কথা ব্যাকআপ টিমের। কিন্তু কোথায় কে? আশেপাশে তখন টাঙ্গি,লাঠি, থ্রি নট থ্রি নিয়ে দূর থেকে তাদের ঘিরে ফেলার প্রস্তুতি শুরু করেছে কমিটির লোকেরা।

পাল্টানো হল সিদ্ধান্ত।

ছত্রধরকে ওই অবস্থাতেই নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা শুরু করল দু'জন। রাস্তাটা কোনদিকে, সেটা জানার জন্য এবার নিজের জিপিএসের দিকে তাকাল অনির্বাণ। দেখতেই শরীর দিয়ে যেন হিমস্রোত বয়ে গেল। ব্যাটারি সিগন্যাল দেওয়া শুরু করেছে ততক্ষণে। হয়তো আর কয়েক সেকেন্ড তার আয়ু। তারপর দিকশূন্য হয়ে যাবে তারা।

মাথায় পিস্তল ঠেকানো অবস্থাতেই ছত্রধরকে হিসহিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল অনির্বাণ, 'কোথা দিয়ে পাকা রাস্তায় উঠব জানা এক্ষুণি। না হলে গুলি করে দিয়ে দৌড়ে পালিয়ে যাব।' ডানহাত দিয়ে বেরনোর রাস্তা দেখিয়ে দিলেন কমিটির নেতা। তাঁর তো তখন সম্মান খোয়ানোর ভয়!

কাঁচা পথ ধরে মিনিট পাঁচেক হাঁটার পরই সদর রাস্তায় উঠে গেল তারা। আশেপাশে কোনও লোকজন বা গাড়ি দেখা গেল না।

আচমকাই একটা লোকভর্তি বাস আসতে দেখা গেল ওই রাস্তায়। এমনিতেই রাস্তা কেটে দেওয়া,গাছ ফেলে রাখার কারণে লালগড় রুট দিয়ে সব বাস চলাচল বন্ধ হয়ে রয়েছে। কিন্তু পুজো থাকায় কয়েকদিনের জন্য বাস চলাচলে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছে কমিটি। পাল্টা আঘাত আসার সম্ভবনা থেকে অনির্বাণ বেশ জোরে জোরে রাঘবকে বলে উঠল, 'চলুন,এটাতে উঠে পড়ি।' দূর থেকে আসা বাসের সামনে দু'জন দাঁড়িয়ে পড়ায় সাটল ব্রেক মেরে থেমে গেল গাড়িটা। চালকের দিকে গিয়ে অনির্বাণ বলল, 'ভয় পাস না, আমরা পুলিশ। তোর গাড়িতে উঠব।' টান মেরে গাড়িতে তোলা হল ছত্রধরকে, তারপর উঠল দু'জনে।

বাসটা আস্তে আস্তে চলতেও শুরু করল। অনির্বাণ ভেতরে তাকিয়ে দেখল যারা বাসে বসে রয়েছে তারা প্রত্যেকেই স্থানীয় বাসিন্দা। তার পুলিশি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আভাস দিল, চলন্ত বাসে এরা সবাই যদি ঘিরে ধরে, তাহলে কিছু করার থাকবে না। ফলে আবার চালককে চেঁচিয়ে নির্দেশ দিল বাস আরও একবার থামাতে। দ্রুত নেমে পড়ল অনির্বাণ এবং রাঘব। সঙ্গে ছত্রধর।

এসব করতে করতে প্রায় কুড়ি মিনিট কেটে গেল। এতটা সময় পেরিয়ে এলেও দেখা পাওয়া যাচ্ছিল না ব্যাকআপ ফোর্সের।

ততক্ষণে জিপিএস কাজ করা বন্ধ করে দিয়েছিল। বাইক নিয়ে পালিয়েও গিয়েছিলেন বাকি তিন সাংবাদিক। যা থাকে কপালে এই ভেবে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নিয়ে সদর রাস্তা ধরে হাঁটা শুরু করলেন দুই ছদ্মবেশী সাংবাদিক। তাদের সঙ্গে সদ্য ধৃত ছত্রধর মাহাতোও।

খানিকটা পথ এগিয়ে যেতেই হাওয়ার মধ্যে থেকে একটা পুলিশের গাড়ি যেন উড়ে এল তাদের সামনে। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সেই গাড়ি থেকে নেমে এলেন একঝাঁক মহিলা অফিসার। তারা ইনস্যাস উঁচিয়ে ঘিরে ধরলেন দুই পুলিশ কর্মীর মাথাতে। পুরো বিষয়টাই কেমন যেন গুলিয়ে গেল দুই পুলিশ কর্মীর কাছে। 'এরা কারা, এল কোথা থেকে'—অনির্বাণের মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

প্রায় পাঁচ মিনিট তিনজনকে ঘিরে রইল প্রমিলা বাহিনী। ছত্রধর অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলেন। তিনিও বিস্মিত।

তাহলে কারা আসল পুলিশ? ধন্দটা কাটতে আরও মিনিট পাঁচেক সময় লাগল। একটা গাড়ি করে তিরের গতিতে সেখানে পৌছে গেলেন রাকেশ। গাড়ি থেকে লাফিয়ে নামলেন তিনি। তারপর সেই প্রমিলা বাহিনীর ভিড় ঠেলে টেনে বার করলেন ছত্রধরকে। সবার সামনে বিরাশি সিক্কার একটা থাপ্পড় কষিয়ে মারলেন ছত্রর গালে। সেই থাপ্পড়ের চোটে ছিটকে দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ির ভেতর গিয়ে পড়লেন ছত্রধর। বাকি অনির্বাণ আর রাঘব বসকে সামনে পেয়ে সুরসুর করে গাড়িতে গিয়ে বসে পড়ল। হু হু করে ছুটতে লাগল এসটিএফের বোলেরো।

ঝিটকার জঙ্গল দিয়ে গাড়িটা চলার সময় বস সবাইকে চমকে দিয়ে চকাস করে একটা চুমু খেলেন অনির্বাণের গালে। তারপর ছত্রর দিকে তাকিয়ে চিৎকার করে বললেন, 'কেয়া রে বহুত বড়া নেতা বন গিয়া থা?' যে কোনও খুশির সময় আনন্দে বসের মুখ দিয়ে চট করে হিন্দি বেরিয়ে আসে। ফলে বোঝা গেল তিনি যারপরনাই উল্লসিত। আরও খানিকটা এগিয়ে গিয়ে দেখা গেল তাদের গাড়ি করে ফলো করে আরও একটা গাড়িতে পিছনে আসছেন আইপিএস ঋদ্ধিনাথ গুপ্তা। তিনি সিআইএফ কর্তা।

অনির্বাণরা অবাক হলেও এটা বুঝল, সকাল থেকে কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে লোকাল লেভেলে এখানেই কন্ট্রোল রুম খুলে বসেছিলেন দুই দুঁদে অফিসার। কিছুক্ষণের মধ্যে কন্ট্রোলরুমে ডিউটি অফিসারের কাছে রিপোর্ট করতে শোনা গেল ব্যাকআপ ফোর্সকে—'স্যার, আমরা তো লালগড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি, কোথাও কেউ তো নেই। আর আমাদের জিপিএসও কাজ করছে না।' কড়া ভাবে পাল্টা নির্দেশ গেল, 'স্ট্যান্ডডাউন করুন আপনারা। আর বরফের গাড়ি লালগড় থানায় পৌছে দিয়ে, বেলুনগুলো আকাশে উড়িয়ে দিন।'

সব বুঝলেও এটার মানে বোঝা গেল না। নিজস্ব কৌতূহল মেটাতে একটু সাহস সঞ্চয় করে অনির্বাণ জিজ্ঞাসা করেই ফেলল, 'কীসের বেলুন?'

মুচকি একটা হাসি মুখে এনে রাকেশ জবাব দিলেন, 'সকালে যাদের বরফ বিক্রি করতে, বেলুন বিক্রি করতে দেখেছো। তারাই ছিল আমাদের ব্যাকআপ ফোর্স।'

রাতেই ছত্রধরকে নিয়ে আসা হল ভবানী ভবনে। অনির্বাণকেও আনা হল শহরে। মধ্য কলকাতার নামী রেস্তোরাঁয় রাতের আহার সেরে গোঁফ আর মাথার চুল নেড়া করে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হল নিজের জেলা মুর্শিদাবাদে। কয়েকদিনের ছুটিতে।

শেষ হল অপারেশন কেবিসির প্রথম ধাপ। শেষের শুরুও হল এরাজ্যের মাওবাদী আন্দোলনের।

# Table of Contents


| | |
|---|---|
| Title Page | 1 |
| Copyright Page | 2 |
| Dedication Page | 3 |
| ভূমিকা | 4 |
| মুখবন্ধ : এক বাস্তবের গল্প | 5 |
| আমার কথা | 6 |
| সূচিপত্র | 9 |
| সাংবাদিক অরিন্দম | 10 |
| পুলিশ অরিন্দম | 20 |
| ছদ্মবেশী অনির্বাণ | 71 |